শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

SHRESTHA KABITA
A Collection of selected poems in Bengali
by SHAKTI CHATTOPADHYAYA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs. 100.00

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৯, মার্চ ১৯৭৩
প্রথম দে'জ পরিবর্ধিত সংস্করণ : ১৩৮৪ আষাঢ়, জুন ১৯৭৭
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৮৯ জ্যৈষ্ঠ, মে ১৯৮২
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ : ১৩৯২ জ্যৈষ্ঠ, জুন ১৯৮৬
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ : ১৩৯৫ মাঘ, জানুয়ারি ১৯৮৯
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : ১৩৯৮ বৈশাখ, এপ্রিল ১৯৯৫
রিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সপ্তম সংস্করণ : ১৪০৩ অগ্রহায়ণ, ডিসেম্বর ১৯৯৬
অষ্টম সংস্করণ : ১৪০৫ পৌষ, জানুয়ারি ১৯৯৯
নবম সংস্করণ : ১৪০৮ মাঘ, জানুয়ারি ২০০২
দশম সংস্করণ : ১৪১০ ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি ২০০৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম : ১০০ টাকা

ISBN-81-7079-094-8

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশকের নিবেদন

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র এই নতুন সংস্করণে অনেকগুলো কবিতা নতুনভাবে যুক্ত করা হ'লো, যা আগের সংস্করণে ছিলো না। নতুন কবিতাগুলো 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো', 'কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে', 'কক্সবাজারে সন্ধ্যা', এবং 'ও চির প্রণম্য অগ্নি' এই চারটি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচন করেছেন স্বয়ং কবিই।

নতুন এই সংস্করণ পাঠকদের ভালো লাগবে মনে হয়। সকলের সহযোগিতা ও মতামত প্রার্থনা করি।

সুধাংশুশেখর দে

জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার কোনো কবিতার বই-এ 'শ্রেষ্ঠ' পদবন্ধটি নির্বিকারভাবে জুড়ে আছে—কল্পনা করাও শক্ত। তবু, পাকেচক্রে হয়ে গেছে বলে, পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কবিতা ভালো-মন্দেই মিশে থাকে, হয়তো। লিখেছি, প্রকাশিত করেছি—কেউ উপযুক্তভাবে নিয়েছেন, কারো কাছে আবার তা অনর্থ। আমার নিজের কাছে, একাকীর কাছে, কবিতা অবলম্বন। নিজেকে নিজের মতো করে দেখার চমৎকার জলজ দর্পণ এক। জলজ কথাটি ভেবেচিন্তেই বসিয়েছি। মোটামুটিভাবে নির্বাচনে দোষগুণ আমাতেই বর্তাবে। প্রকাশিত বইগুলি থেকে দ্রুত দাগ মারার ব্যাপার —খুব একটা ভেবেচিন্তে নয়। ফলে, হতে পারে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কবিতা বাদ রয়ে গেছে। ক্ষতি নেই। একবার লিখে ফেলার পর—সেই পুরনো লেখার প্রতি তেমন মনোযোগ, অনেকের মতো, আমারও নেই। সুতরাং সে-ব্যাপারেও সহযোগী পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখাই ভালো আগেভাগে।

এই পর্যায়ভুক্ত অনেক কবিই অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্য থেকে তাঁদের কিছু কিছু তর্জমা গ্রন্থে রেখেছেন। আমি ইচ্ছে করেই রাখিনি, কেননা, আমার নিজস্ব রচনা পরিমাণে একটু বেশি। প্রচ্ছদচিত্র তৈরি করে দিয়েছেন আমার বন্ধু শ্রীপ্রকাশ কর্মকার। তাঁর সৃজনশীল কাজের ফাঁকে —এই সামান্য কর্ম, আমাকে তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ করে রাখলো। ইতি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দে'জ সংস্করণের ভূমিকা

এই পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে অবান্তর প্রথম গ্রন্থ থেকে বেশ কিছু পদ্য বাদ দিয়ে নতুন অনেকগুলি পদ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। চার বছর আগেকার ভারবি-প্রকাশিত বইটি দে'জ পাবলিশিং বের করতে আগ্রহী হলেন। এই চার বছরে অন্তত আমার দেড় ডজন পদ্যের বই বেরিয়েছে। তাদের কয়েকটির মধ্যে থেকে বেছে কিছু পদ্য, যা আমার মন্দ লাগে না পড়তে, পুনর্মুদ্রিত করা হলো। বেশ কয়েকটি

বই থেকে বাছাই করা সম্ভব হলো না, শুধুমাত্র বইয়ের প্রস্থ বেড়ে যাবে, এই ভয়ে। দাম বেড়ে যাবে। পূর্ববর্তী কোনো সংস্করণে প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন শিল্পী প্রকাশ কর্মকার। তিনি এখন কার্যব্যপদেশে এলাহাবাদবাসী। পূর্ণেন্দু পত্রী আমাদের দীর্ঘদিনের কবিবন্ধু। তাঁর দক্ষিণ-বাহু আমাদের বহু প্রচ্ছদপটে। আমার একার, বা আমাদের কোন দুজনের না, বাংলা কবিতার বই তাঁর বর্ণলাঞ্ছন ছাড়া বেরুবার জো নেই। ইতি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১লা আষাঢ়, ১৩৮৪

দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে

দ্বিতীয় সংস্করণের বহর নির্দয়ভাবে কাঁচিকাটা করে এবং সদ্য প্রকাশিত এক-আধটি বই থেকে পদ্য-বাছাই স্থগিত রেখে, এই নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। এছাড়া, পূর্ব-সংস্করণে অসংকলিত অনেক নতুন পদ্য ঠাঁই পেয়েছে এখানে। এতো-শত সাবধানতার পরেও গ্রন্থমূল্য বেড়ে গেলো বলে আমরা দুঃখিত।

১৯ কর্ণেল বিশ্বাস রোড — শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা-১৯ — ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৯

দে'জ তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই নতুন সংস্করণে আমার শেষদিকে প্রকাশিত তিন-চারটি পদ্যর বই থেকে কিছু কিছু পদ্য দিয়েছি। ফলে, পুরনো কিছু পদ্য বাদ দিতে হয়েছে। পাঠকসাধারণ মার্জনা করবেন। ইতি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩

সূচীপত্র

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য [প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬৭]

জরাসন্ধ ১৭
কারনেশন ১৭
নিয়তি ১৮
পরস্ত্রী ১৯
চতুরঙ্গে ১৯
জন্ম এবং পুরুষ ২০
বাহির থেকে ২১
শবযাত্রী সন্দিগ্ধ ২১
ঝর্না ২২
প্রত্যাবর্তিত ২২
বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে ? ২৩
ভ্রান্তি ২৪
মুকুর ২৪
পাবো প্রেম কান পেতে রেখে ২৫
ফুল কি আমায় ২৬
অন্ধকার শালবন ২৬
পিঠের কাছে ছিলো ২৭
ছায়ামারীচের বনে ২৭
কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস ২৮
আঁচলের খুঁট ধ'রে গ্রাস করবো ২৯

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো [প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৭২]

প্রেম ৩০
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে ৩০
যখন বৃষ্টি নামলো ৩১
মনে পড়লো ৩২
এবার হয়েছে সন্ধ্যা ৩৩
আনন্দ-ভৈরবী ৩৪
অবনী বাড়ি আছো ৩৫
চাবি ৩৫

ঝাউয়ের ডাকে ৩৬
স্থায়ী ৩৭
জুলেখা ডব্‌সন ৩৭
হৃদয়পুর ৩৮
আমি স্বেচ্ছাচারী ৩৮
হলুদবাড়ি ৩৯
সরোজিনী বুঝেছিলো ৪০
কোনোদিনই পাবে না আমাকে ৪০

সোনার মাছি খুন করেছি [প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭৪ ; ১৯৬৭]

বিষ-পি পড়ে ৪১
নীল ভালোবাসায় ৪২
যেতে-যেতে ৪৩
পাখি আমার একলা পাখি ৪৪
তোমার হাত ৪৫
এই বিদেশে ৪৫
সে বুড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয় ৪৬

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান [প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৭৫ ; ১৯৬৮]

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে ৪৮
স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট, তুমি ৪৯
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ৫০
স্মরণিকা ৫২
ধীরে ধীরে ৫৩
সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি ৫৪
কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরানো চাঁদ ৫৫
মজা হোক—ভারি মজা হোক ৫৭
মন্দিরে, ঐ নীল চূড়া ৫৯
মধ্যবর্তী বিষণ্ণতা ৫৯
এক অসুখে দুজন অন্ধ ৬০
ইতস্তত মধুর ঘোরে এই অরণ্যে ৬১

পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি [প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ ; ১৯৭১]

আজ আমি ৬১
একবার তুমি ৬৩
অবসর নেই—তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না ৬৪

আমরা সকলেই ৬৫
দেখি, কে হারে ৬৭
পোকায় কাটা কাগজপত্র ৬৮

চতুর্দশপদী কবিতাবলী [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৭৯ ; ১৯৭২]
চতুর্দশপদী কবিতাবলী ৬৯

প্রভু-নষ্ট হয়ে যাই [প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৭৯ ; ১৯৭২]
কীসের জন্যে ৮২
একটি পরমাদ ৮৩
বাঘ ৮৪
আমি ভাঙায় গড়া মানুষ ৮৪
ভুল থেকে গেছে ৮৫
কে যায় এবং কে কে ৮৬
এখানে সেই অস্থিরতা ৮৬
কবিতার সত্যে ৮৭
সে—তার প্রতিচ্ছবি ৮৮
দুই শূন্যে ৮৯
কেউ নেই ৮৯
দুঃখ যদি ৯০
অন্ধ আমি অন্তরে-বাহিরে ৯০
একদিন ৯১
সব হবে ৯১

সুখে আছি [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮১ ; ১৯৭৪]
আসতে পারে ৯২
চাঁদের দেশে ৯২
বিরহ তার পাত্র থেকে আগুন ঢালছে ৯৩
ছটফটিয়ে উঠলো জলে ৯৩
এখানে কবিতা পেলে গাছে-গাছে কবিতা টাঙাবো ৯৪
এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার বসন্তের দিনে ৯৬

ঈশ্বর থাকেন জলে [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮২ ; ১৯৭৫]
আজ সকলই কিংবদন্তী ৯৮
কবির মৃত্যু ৯৯
এক হতচ্ছাড়া যুদ্ধ চাই ১০০
আমি সন্ত করি ১০০

দূরে ঐ যে বাড়িটা ১০১
কার জন্যে এসেছেন ? ১০২
আমাদের সম্পর্কে ১০৩
তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল ১০৩
জন্মে থেকেই মাটির ওপর ১০৬
তাঁকে ১০৭
জল পড়ে ১০৭
রক্তের দাগ ১০৮
ঐ গাছ ১০৮
তিনি এসে উঠেছেন ১০৯
পাথর গড়িয়ে পড়ে গাছ পড়ে বোধে ১০৯

অন্যের গৌরবহীন একা [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮২; ১৯৭৫]
নদীর পাশে সবুজ গাছে ১১০
যে-কিশোর হৃদয়ে বসেছে ১১১
কিছুক্ষণের জন্যে ১১১
মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি ১১২
নিঃশব্দচরণে প্রেম ১১৩
এবার আমি ফিরি ১১৪
জানিনা কোথায় শব্দ ১১৫
টেবোর বাংলোয় রাত ১১৬
আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি ১১৭
দশগী ১১৭
কষ্ট হয় ১১৮
যখন একাকী আমি একা ১১৯

জলন্ত রুমাল [প্রথম প্রকাশ ; বৈশাখ, ১৩৮২ ; ১৯৭৫]
নিচে নামছে ১১৯
এই সিংহাসন, তার পায়ে বাজ ১২০
চলে গেলো ১২১
মানুষের মধ্যে আছো ১২২
দুঃখ ১২২
জলন্ত রুমাল ১২৩

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৮২ ; ১৯৭৫]
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ১২৩

হৃদয় এখানে নয় [প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩ ; ১৯৭৬]

শব্দের ঝর্ণায় স্নান
শিকড়ের মতো, একা ১৪৩
মরার কথায় ১৪৪
সহজ ১৪৪
গাছ কেন ১৪৫

কবিতায় তুলো ওড়ে [প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা, ১৩৮৩ ; ১৯৭৬]

ফুলঝুরি, তোমার নাম ১৪৫
একদেশে সে মানুষ ১৪৬
ভালোবাসা ১৪৬
কেন যাবো ? ১৪৭
সন্ধ্যা হয়ে এলো ১৪৭
একটি পাথর দুটি পাথর ১৪৮
অন্ধকারে ১৪৮
কবিতার তুলো ওড়ে ১৪৯
চাঁদের কাছে ১৪৯
মাথার উপর এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ ১৪৯

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল [১৯৭৬, ১৩৮৩]

নামছে মেঘ ১৫০
তোমার-আমার মধ্যে ছিলো নীল হ্যারিকেন ১৫২
আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল ১৫৩
আমার অনুপস্থিতির সুযোগে ১৫৪
যে-পথের যাবার ১৫৫
ভাষার বাঁধনে ১৫৫
ঋত্বিক, তোমার জন্য ১৫৬

হেমন্ত যেখানে থাকে [১৩৮৪]

হারিয়ে গেছে ১৫৭
করো—অমলের জন্যে যা করেছো ১৫৭
বস্তুর গ্রন্থনা থেকে এইভাবে ১৫৮
অমল প্রাসাদের জন্য ১৫৮

এই আমি যে পাথরে [১৩৮৫ ; আগস্ট ১৯৭৭]

সমুদ্রের পারে ১৫৯
রূপবান ১৫৯

পলিমাটি নখে ছিঁড়ে ১৬০
পাতাল থেকে ডাকছি ১৬১
বাদামের পাতা তুমি ১৬২
তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না ১৬২
মিশে গেছি শব্দের সহিত ১৬৩
মৃত্যুর বিষয়ে ১৬৪

মানুষ বড়ো কাঁদছে [১৩৮৫ ; নভেম্বর ১৯৭৮]

ও গাছ, আমাকে নাও ১৬৪
মানুষ যেভাবে কাঁদে ১৬৫
এই দুর্গে কিছু লোক ১৬৫
নীলকণ্ঠ তুমি, তুমি অভিমন্যু ১৬৬
দাঁড়াও ১৬৭
এইটুকু তো জীবন ১৬৭
পোড়াতে পারে না ১৬৮

ভালোবেসে ধুলোয় মেখেছি [১৩৮৯ ; ১৯৭৮]

কেন ? ১৬৯
তাঁর কাছে ১৬৯
তন্ময়তা ১৭০
তার মমতা ১৭০

ভাত নেই পাথর রয়েছে [প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৮৬ ; ১৯৭৯]

ভাত নেই, পাথর রয়েছে ১৭১
ছেলেটা ১৭১
মানুষ কিভাবে মরে ১৭২
পাতার শোকে ১৭৩
গাছের নিচে ১৭৩
পোড়াতে চাই ১৭৪
কথা বলছে না ১৭৪
এই ছোট সংসারে দীর্ঘতা ১৭৫
ভালোবাসা, তার কাছে ১৭৬
জামা কতদিনে ছেঁড়ে ১৭৬
আমি চাই ১৭৭
সময় হয়েছে ১৭৮
ভিক্ষা চায় ১৭৮

এই পরিশ্রম ১৭৯
মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে ১৭৯

অঞ্জুরী তোর হিরণ্য জল [প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৮৭]
একটি স্রোতে ১৮০
কী জানি ১৮১
অঞ্জুরী তোর, হিরণ্য জল ১৮১
কবিতা লেখার ক্লান্তি ১৮২
কাছে এসো, ব'লে তুমি ১৮২
আমি সে মৃত্যুর পাতে ১৮৩
এ-কাপড় শুকোনো যাবে না ১৮৩
তুমি তাঁরই জটিল সন্তান ১৮৪
নীল একটি ছেলে-ভুলানো ছড়া ১৮৫
সহজ ১৮৫
কিছুটা ১৮৫
প্রীতিভাজনেষু ১৮৬
আমি দেখি ১৮৬
কলকাতার বুক পেতে বৃষ্টি ১৮৭

মন্ত্রের মতন আছি স্থির [বৈশাখ ১৩৮৭ ; ১৯৮০]
এভাবেই যাবে ? ১৮৮
ইছামতী : বালিতে পায়ের দাগ ১৮৮
আগুনে যে-দুঃখ ১৮৯
একা ১৮৯

মৃন্ময় রহস্যময় [১৯৮০]
ভয় আমার পিছু নিয়েছে ১৯০

আমাকে দাও কোল [মার্চ ১৯৮০]
শিকড়-বাকড় ১৯৮
জন্মদিনের মঞ্চে মৃত ১৯৯
লজ্জায়-লজ্জায় ১৯৯
কারণ তো নেই, কারণ তো নেই ২০০
আমাকে দাও কোল ২০১

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ [প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৮৮ ; ১৯৮২]
বলা যায় ? ২০১
আসছো কবে ? ২০১

কিসের কাজ, কেন ? ২০২
জানে, ভেঙে দিলে তবে গড়া হয় ২০৩
জঙ্গলে যাবার ২০৪
জঙ্গলের মধ্যে ঘর ঈশ্বর গড়েন ২০৫
পরিত্রাণ চাই ২০৮
ও অবিচল ২০৯
বিবাহ ও বিসর্জন ২০৯
তুমি আছো, সেইভাবে আছো ২১০
মনে হয়, কিছুই দেবে না ২১১
বেঁচে আছি ২১২
প্রচ্ছন্ন প্রদেশ ২১৩

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো [প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৮২ ; ১৩৮৮]

যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো ? ২১৪
বিড়াল ২১৫
বলো, ভালোবাসো ২১৫
পুরনো নতুন দুঃখ ২১৬
সুদর্শন পোকা ২১৬
সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা ২১৭
শাক্য ২১৮
যদি পারো দুঃখ দাও ২১৮
ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো ২১৯
এপিটাফ ২২০

আমি চলে যেতে পারি [১৩৮৬ ; ১৯৮৩ এপ্রিল]

কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে [প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৮৩]

সমূহে একা রেখা ২২০
সুখে থেকো পিতরো ! ২২১
বিরহে যদি দাঁড়িয়ে ওঠো ২২২
এই উজ্জ্বলতা অল্প ২২২
যেখানে দাঁড়াই, ভুল ২২৩
মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার ২২৩
দুঃখের অখণ্ড চাপ ২২৪
বাগানের কেউ নয় নষ্ট ফল ২২৪
আপন ছবি ২২৫

যাবার সময় ২২৫
আমি এই সংকল্প নিয়েছি ২২৬

কক্সবাজারে সন্ধ্যা [প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৮৪]

কক্সবাজারে সন্ধ্যা ২২৭
আমার কাছে এসো না ২২৮
চারশ বছর প্রাচীনতা ২২৮
জন্মদিনে ২২৯

ও চিরপ্রণম্য অগ্নি [প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৮৫]

জন্মদিনে ২২৯
ও চিরপ্রণম্য অগ্নি ২৩০
স্মরণীয় ২৩০
লিচু চোর ২৩১
সন্ধ্যায় ২৩২
কারাগার ২৩৩
সাঁকো ২৩৩
অজিতেশ ২৩৩
পারলে হারে ২৩৪
কলকাতায়, ভোরে ২৩৫
দুই চন্দ্রই ২৩৬
পাতাল সিঁড়ি ২৩৬
একটি সমাজ ২৩৭
পারান্ত কই ? ২৩৭

এই তো মর্মরমূর্তি [১৯৮৭, জানু]

এই তো মর্মরমূর্তি ! ২৩৮
ছেলেটি ঘুমন্ত হাতে ২৩৯
শব্দের ভিতরে ছিলে ২৩৯
শেষ হবে, এভাবেই হয় ২৪০
কবিতা টাঙাতে হয় ২৪০
ধান কাটা শেষ, কবিমশাই ২৪১

আমাকে জাগাও [১৯৮৯, জানু] ছবি আঁকে হিঁড়ে কালে [১৯৯১]

আমাকে জাগাও ২৪২
এ বয়েসে ২৪৪
যাবার সময় হলো ২৪৪

ও অনন্যমনা ২৪৫
ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে ২৪৬
সকলের চেয়ে বেশী অহংকার নিয়ে ২৪৬
গাছ কথা বলে ২৪৭

জঙ্গল বিবাদে আছে [১৯৯৪]
ভেঙে থেকে না খেলার অপরাধ গ্লানি ২৪৮
ঈশ্বর আছেন একা ২৪৯
পাখি ২৪৯
এই কুষ্ঠরোগী প্রাণ ২৫০
অন্যথা করো না ২৫০
অসমগ্রন্থনা ২৫১
দায় ২৫১

কিছু মায়া রয়ে গেল [১৯৯৬]
ফিরে এসো মালবিকা ২৫২
এলিজি (সমরেশ বসু স্মরণে) ২৫২
শাদা পাতা ২৫৩
প্রাসঙ্গিক ২৫৪
শুধু এই ২৫৪

জরাসন্ধ

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখদুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে
তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায়
বিঁধে কাতর হ'লো পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে
তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার
অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র
হ'লো, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন
তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনো অনঙ্গ
অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র! তুই তোর জরার হাতে কঠিন
বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে
নামলে সমুদ্র স'রে যাবে শীতল স'রে যাবে মৃত্যু স'রে যাবে।
তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার
থাকবো, বা অন্ধকার হবো।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

কারনেশন

প্রভেদ জটিল, অবগুণ্ঠিত সড়কে চাঁদের আলো
তাকে দিয়ো অই ফুলটি কারনেশন।
কতদিন তার মুখও দেখিনি, চেনা পদশাত পিছল অলক কালো
ও-ফুলের কথা বোলো না কাউকে বুড়ো মালঞ্চ,

মায়াবী সকাল ফিরে এনেছে কে, কে মঞ্জরীর অস্বচ্ছ আলোছায়ে
বাগানে ঘুরছে স্খলিত নিদ্রা, কেই-বা দুপুরে
ঘুমায় উষ্ণ বায়ুর বিলাসে ঝাঁ ঝাঁ গায়ে গায়ে
ফুরোয় দুপুর ফুরোয় সন্ধ্যা শুধু জলরেখা শুধু জলরেখা।

২

হাওয়া খোলে মাটি নীহার অরুণ পুকুরে শব্দ
সারারাত ম্লান মেছো বক ছিলো পুকুরের পাশে
আমার মতন আয়নায় দেখে মুখ আর মন
ধার কথা ভাবে সে কিসের রেখা জলরেখা নয় ?
হয়তো সড়ক জমাট অন্ধ, কেন আলো ফেলো ?
কেন আলো ফেলো অকারণ মৃদু চমকায় মন ;
সাম্প্রতিকের যা দেবার আছে, নাও কেশে পরো
সে কারনেশন শাদা আর লাল, সে কারনেসন !

নিয়তি

বাগানে অদ্ভুত গন্ধ, এসো ফিরি আমরা দু-জনে।
হাতের শৃঙ্খল ভাঙো, গায়ে প'ড়ে কাঁপুক ভ্রমর
যা-কিছু ধূলার ভার, মানসিক ভাষায় পুরানো
কাকে রেখে ফিরে যাই দু-জন দু-পথে মনে-মনে।

বয়স অনেক হ'লো নিরবধি তোমার দুয়ার…
অনুকূল চন্দ্রালোক স্বপ্নে-স্বপ্নে নিয়ে যায় কোথা ?
নাতি-উষ্ণ কামনার রশ্মি তব লাক্ষারসে আর
ভ'রো না, কুড়াও হাতে সামুদ্রিক আঁচলের সীমা।

সে-বেলা গেলেই ভালো যা ভোলাবে গাঢ় এলোচুলে
রূপসী মুখের ভাঁজে হায় নীল প্রবাসী কৌতুক ;

বিরতির হে মালঞ্চ, আপতিক সুখের নিরালা
বিষাদেরে কেন ঢাকো প্রয়াসে সুগন্ধি বনফুলে।

তারে দাও কোলে করি অনভিজ্ঞ প্রাসাদ আমার
বালকের মৃতদেহ, নিষ্পলক ব্যাধি, ভীত প্রেম।
তুমি ফেরো প্রাকৃতিক, আমি বসি কৃত্রিম জীবনে
শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গণ্ড, পাকে গুহ্যদেশ।

পরস্ত্রী

যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো
যাবো না আর ঘরে
সব শেষের তারা মিলালো আকাশ খুঁজে তাকে পাবে না
ধ'রে-বেঁধে নিতেও পারো তবু সে-মন ঘরে যাবে না
বালক আজও বকুল কুড়ায় তুমি কপালে কী পরেছো
কখন যেন পরে ?
সবার বয়স হয় আমার বালক-বয়স বাড়ে না কেন
চতুর্দিকে সহজ শান্ত হৃদয় কেন স্রোতসফেন
মুখচ্ছবি সুশ্রী অমন, কপাল জুড়ে কী পরেছো
অচেনা, কিছু চেনাও চিরতরে।

চতুরঙ্গে

খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য
নিজস্ব গৃহে প্রজ্ঞা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার
কিছু কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না।

এই অপরূপ পৃথিবী, সেদিকে যাবো না মিথ্যা
বাসনা যেমন চঞ্চল তার নিশানা জানি না
রমণী কখন প্রিয় করে হা রে হৃদয় জানে কি ?
তা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।

শুধু যা দৃশ্য, অন্তঃস্থল যে খোঁড়ে খুঁড়ুক
ভাসমান নদী ভাসাও নৌকা ভাসাও নৌকা
যৌবন যায়, চ'লে যাবো আমি ; চাষা বা ডুবুরি
ক্ষেতে সংসারে অক্ষয় বাঁচো দৃঢ় জলৌকা।

আহা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি ?
অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী, বাড়ায় শান্তি
প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইবো না আমি গাইতে চাই না।

জন্ম এবং পুরুষ

আবার কে মাথা তোলে ফুলে ফেঁপে একাকার চাঁদ
সাধ হয় মাথা তোলে ফাঁসা মাথা একাকার মাথা
গহ্বরে মাংসের বিড়ে মাড় মুত ফুল রক্তপাত
আগায় দুপাড় পিছে···স্তম্ভ লাল ছিলা লাল, লাথি
ভাঙে ঈশ্বরের মুখ, বোঁচা নাক, সহসা সিন্দুক
খুলে গেছে, দুমড়ে গেছে ; ক্লান্ত শাদা হা ঈশ্বর, ভেক
চিতিয়ে মরেছে রাশি, শাদা পেট উল্লুক চৌতাল
মরা উরু মরা মাছ কুঁচ সাপ বাঁকা নাল ডাঁটা
বুকের বনাত খাদ মুচিড়াব দারুণ গরম
শক্ত লোহা শক্ত দুধ একাকার বিষাক্ত বলক
কে চুরালে মুখ নেবে। শয়তান ও অসম্ভব চূড়া
অফেনা সহসা, ফোলা, ফোলা সব ফোলা অন্ধকার।

যোনির মাড়ির খিল হাট-করা, বেহায়া পাংশুতা
পুচ্ছ গোল নীল পুচ্ছ···হাহাকার, কী মুখে তাকাও
ক্ষুরে ঘা নালি ঘা মুখে কোষ্ঠাকার মৌচাক ধুলায়
মক্ষিহীন পুরাতন, কে ছোঁয়ায় উরুদেশে প্রেম
দ্বিধা, খসে নাভি হৃদি আজীবন হে রম্য পুতলা
তোমার বন্ধনে রাত মৃতদিন উত্তেজনাহীন হে সমস্ত
কুরূপ ছোঁবে না পাপী বিমর্ষতা ঈশ্বরে ভজাও, নিশিদিন···
বড়ো জ্বালা জন্মের প্রখর জ্বালা ফোটালো বৃশ্চিক
প্রেতিনী মায়ের মুখ স'রে যায় বালুচরে তালুচরে জলে।

বাহির থেকে

বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় ও-যে পায়ে পড়ছে এসে
এমন রাতে ঘুম ভাঙাতো স্বপ্নাতুর চোখ
ঘরের ভিতর হাওয়া খেলতো আলুল কালো কেশে
ফুটে উঠতো ফুলের বাগান, যেতে হ'তো না।
জানতাম না চূড়া পাঠায় হাওয়ার শান্ত সৈন্য
কেয়ার নিচে যদিও বাড়ে হাওয়ার ভারি ফণা
বুড়ো দেয়াল ঢেলে রাখছে যৌবনের হল্‌কা
বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় তোমায় চিনতে পারবে না।

বেরিয়ে পড়ো হাওয়ায় হাওয়া বাইরে থেকে আসছে।

শবযাত্রী সন্দিগ্ধ

মড়া পোড়াতে যাবো না বৈকুণ্ঠ, আমরা কি মরবো না।
খোল ভেঙে দে বেতাল ঠেকায় চোখে টলছে হাজার চন্দ্রবোড়া
কালরাতে যে-সাতপহর গাওনা হলো, তর্জা কাপ কবি

বিলেতবার্তি ঝুললো, পোকা, লোকলশকর। কেউ ডেকেছে। কেন।
আমরা কেউ ম'রে গেলেই সঙ্গে যাবো তেমনটি করবো না।
সাধলে কবি সাতপহর মেলায় গিয়ে গান বাঁধবে নানা
আনন্দ কি বৈতরণীর অন্ত পারে বিন্দু পাওয়া যাবে।

ঝর্না

সারঙ্গ, যদি ঝর্না ফোটাই তুমি আসবে কি তুমি আসবে কি
সন্তর্পণ পল্লব দোলে এত অজস্র বন্ধু হাওয়া
গাছের শিরায় ফেটেছে নূপুর অমন নূপুর জলে ভাসবে কি।
পাহাড়খণ্ড পাহাড়খণ্ড ওর নৃত্যের দোষ নিয়ো না হে।

অলস-অলস ভালোবাসা তুমি নদীপথ আঁকো নখে-নখে, তীরে
দাঁড়িয়ে পড়েছে শাদা গাছগুলি, উপঢৌকন সবুজ জড়োয়া
দেখছো না কেন দুলছো না কেন তবু যে পুলিন জল মেশে ধীরে
কোথায় মেশে না? পাহাড়খণ্ড ওর কোনোদিন দোষ নিয়ো না হে।

তৃষ্ণা জড়ায় পাকে-পাকে আহা সারঙ্গ এসো ঝর্নাপ্রান্তে
মাইল-মাইল ধূলাবালি ওড়ে অচ্ছায় ঘত গাছের পাহারা
মুছে যাবে তার নূপুরে, নৃত্যে, শুধু জল টানে পিপাসু ভ্রান্তে
ও ঝর্না ওগো ঝর্না তাহাকে ভালোবাসবে কি ভালোবাসবে কি।

প্রত্যাবর্তিত

নিরস্ত্রের যুদ্ধে যাই শস্ত্র হয় মন।
অন্ধকার পিতার চোখ, আকন্দের আঠা
চুঁইয়ে পড়ে মায়ের গালে, ধাতুর দর্পণ
আমাকে করো ঘাতক, বেঁধো তীক্ষ্ণধার কাঁটা

চক্ষে আর জিহ্বা কাটো অক্রূরের বাণে
আমাকে দাও হত্যা করি আমার সন্তানে।

মন আমার অস্ত্র হয় অন্ধকার বাধা
তার কঠিন হৃদয়ে মারি ঘুম ভাঙার ঘা
অঙ্গ আমার অবশ হ'লো কঠিন হ'লো কাঁদা
অন্ধকার বললো জেগে, এবার ফিরে যা।

অজগরের মাথায় জ্বলে মণির মতো ভোর,
ক্লান্ত বীর এবার ফের ফেরার ঘরে তোর
মা হয়েছেন ফটিক জল, পিতা জোনাক পোকা,
ভিটের ভাঙা ধুলোয় কাঁদে ছাতার-পাখি একা

অন্ধকার তারার চোখ আকাশ পোড়া সরা
ভাগ্য কালো কাকের গা, ক্ষুধার অন্ন জরা।

বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে ?

আমার ভাবনা হ'লো বিশাল বাগান কেমন করে মনে রাখবে
প্রতিটি গাছে পাখিরা আসছে, প্রতিটি দুঃখ
আলোর মান্য উষ্ণতায় মেওয়া ফলের মতন স্বাদু।
ভাবনা হ'লো
গাছের-খাই-তলার-কুড়াই মানসিকতা
সুখের যত বিপুল জড়ো কুড়িয়ে নিতে ঝুড়ি এনেছে।
বয়স হ'লো
আলোর আঁচে রাঙা ফলটি এবার দেখছি কোনরূপেই নিকটবর্তী নয়

ভ্রান্তি

জল যায় রে শিলা আমার বক্ষপট দহে
সলিতালতা রূপসী পোড়ে নিবিড় তরী ভ'রে
ফেরা ভালো ফেরাই ভালো, বাতাসে কত সহে
দহনভার ভস্মভার মরীচিভার মালা ?

রাখো কোথায় ? ছিন্নপট বিনা-হৃদয় জুড়ে
হে শিলামালা চরণমূলে রাখিবে ধ'রে যদি
ফিরায়ো না সে শুভ্র হাঁস নখরাহতে ধীরে
নভোছায়ায় মগ্ন যেথা লুটায় রেখা-নদী

জল যায় রে এমন দিনে চাঁচর মুখপানে
তারাভিলাষী মাতাল শূক ফেনাবগাঢ় রাতে
পুড়িয়া মরে মান্দাসিনী ছুঁয়ো না মায়াভানে
চরণমূলে চিহ্ন থাক্ শিলাবনত প'ড়ে।

তোমায় কিছু দিয়েছিলাম, প্রীতির ছায়াতলে
নীলাঞ্জন, ঝরিয়া গেলে রম্য চিতাপটে…
চমৎকার বারুণীগতি আছো তো সখা ভালো ?
বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিভার শূন্য নদীতটে।

মুকুর

মৃদঙ্গ বাজত দেখি নাচত চন্দন
কুলশীল জানা নাই রসাবিষ্ট যত
মেলার আলোক নৃত্যপটে মেলার আঁধার বন
হারালো বন হারালো আলো মৃদঙ্গ নাচত রে।

খসিল মৌচাক তারা উচ্ছ্রিত জোছনা রে
তুমি চন্দনে ভোলালে ঘর জনমসুধার ধারা
ধরিলে জোনাকে চন্দন ধরিলে জোনাকে হে
অভ্রফুলে ভাসিল গান বিপথগান বাঁধন-হারা।

প্রভু হে কেন শুকালো ফুল, মুড়ালো গাছ, পীতল মালা
দরদী মুখে মলিন হাসি বুঝিনি ছল শিল্পকূট
প্রিয় আমার নিয়েছো সব, ভ্রান্ত কর, নীরব, লুলা
স্বপ্ন নাও স্মৃতিও নাও পদ্ম নাও অক্ষিপুটে।

মৃদঙ্গ বাজত না রে নাচত চন্দন
চলো চন্দন মেলায় যাবো শূন্যমেলা চিতল ভঙ্গ,
নীরবে থেকো হে তারা সখি আঁধারতম আঁধার বন
লুলা হাতের পাতকী নাচে তুমিই তো মৃদঙ্গ রে।

পাবো প্রেম কান পেতে রেখে

বড়ো দীর্ঘতম বুকে ব'সে আছো দেবতা আমার।
শিকড়ে, বিহ্বল-প্রান্তে, কান পেতে আছি নিশিদিন
সম্ভ্রমের মূল কোথা এ-মাটির নিথর বিস্তারে ;
সেইখানে শুয়ে আছি মনে পড়ে, তার মনে পড়ে ?

যেখানে শুইয়ে গেলে ধীরে-ধীরে কত দূরে আজ !
স্মারক বাগানখানি গাছ হ'য়ে আমার ভিতরে
শুধু স্বপ্ন দীর্ঘকায়, তার ফুল-পাতা-ফল-শাখা
তোমাদের খোঁড়া-বাসা শূন্য ক'রে পলাতক হ'লো।

আপনারে খুঁজি আর খুঁজি তারে সঞ্চারে আমার
পুরানো স্পর্শের মগ্ন কোথা আছো ? বুঝি ভুলে গেলে।

নীলিমা-ঔদাস্যে মনে পড়েনাকো গোষ্ঠের সংকেত ;
দেবতা, সুদূর বৃক্ষে, পাবো প্রেম কান পেতে রেখে।

ফুল কি আমায়

আলস্যে এ কি ভাঙা-অভাঙায় মেলানো আমার।
স্পৃহায় ক্লান্ত মর্ত্যভূমির সীমানায় দেখি
রেখার আঁধার ধারাবাহিকতা চায় না আলোরে ;
ফুল কি আমায় অমোঘ মুঠায় ফিরে যেতে বলে ?

মনে হয় কোনো সমূহ হরিণ পিছোয় যেদিকে
আমরা যাবো না
আমরা শুধুই নাচতে থাকবো, পাহাড়-তলায়, ঝর্নার ধারে
চূড়ায়-চূড়ায়, বাঁকা ভুল-পথে নাচতে থাকবো আমরা শুধুই,
ফুল কি আমায় অমোঘ মুঠায় ফিরে যেতে বলে ?

অন্ধকার শালবন

কোথা ব'সে ছিলে ? যাবার সময় দেখছি শুধুই
ঝরছে পাতার শিথর-গলানো কার এলোচুল।
অবসাদ আর নামে না আমার সন্ধে থেকে,
ছুটে কে তুলিলে শালবন, ঘনবন্ধন চারিধারে ?

ফিরেছি, তোমায় দেখবো, তোমায় দেখতে পাচ্ছি
হয়তো তোমায় ; স্ফটিক জলের মতন বেঁকানো
কানের পাতার তল ব'য়ে ওড়ে চুলের গুচ্ছ,
তোমার আলোই তোমায় মধুর করেছিলো একা।

বন্ধু আমার, বাদামপাতার শিখরে লুপ্ত
সময়, হে মৃত ডুবো বিষণ্ণ ত্রস্ত মুখোশ
উড়ে চ'লে যাও, কে নেয় আমার সকল লিপ্সা
পশ্চিম দিকে ? কে গো তুমি ব'সে মুখর বিরহ ?

বসে আছো হায়, আত্মার মাঝে জড়ানো পশম,
টেনে নিয়ে গেলে দৃষ্টি, যেখানে মর্মতলে
কেউ জেগে নেই, যথা দিন তথা সন্ধে থেকে—
কেউ কি জাগালে শালবন, বাহুবন্ধন চারিধারে ?

পিঠের কাছে ছিলো

পিঠের কাছে ছিলো শ্যামল আসন
কবে তোমার করুণ অঙ্গুলি
তুলে ময়ূর অথবা রাজহাঁস
মমতা-ভরে দেখিত অপলক।

বুকে আমার, হৃদয়ে বেলাভূমি
তুমি কি মাথা তুলিবে জল থেকে ?
শ্যামলিমার মালিনী, হাতে কই
শিল্পভেদী কুরুশ-কাঁটাগুলি ?

ছায়ামারীচের বনে

হৃদয়ে আমার গন্ধের মৃদুভার,
তুমি নিয়ে চলো ছায়ামারীচের বনে
স্থির গাছ আর বিনীত আকাশ গাঢ়
সহিতে পারি না, হে সখি, অচল মনে।

হারা-মরু-নদী কী দুঃখ অনিবার
তরলা ফলের পাত হৃদে বড়ো বাজে
গহন শোকের হাওয়া ঘেরে মরি-মরি
বরষা কখন ঘন মরীচিকা সাজে।

হে উট. গভীর ধমনী, আমারে নাও
যোজনান্তর কাঁটাগাছ দূরে-দূরে
আরো বহুদূরে কুয়োতলা কালো জল—
হে উট, গভীর উট নাচো ঘুরে-ঘুরে।

কী ধার উজল অবিরত টিলা পড়ে
টিলা নয় যেন বঁড়শি, টিয়ার দাঁত।
অচল আকাশ ছাড়ে না সঙ্গ, জড়ে
বাঁধা থাকে মৃত ভায়োলিন বাড়ে রাত।

ফুটো তাঁবু লাগে পাঁজরে, ফাঁদরা ডুলি,
বুড়ো বেদুইন খরমুজ খায় দেখে
বলি, বড়মিয়াঁ, যাবো সে কমলাপুলি
নিশানা কী তার ? চাঁদ ছিলো চাঁদে লেগে।

কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস

কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস
শিল্পের দক্ষিণপার্শ্ব ভ'রে কালো নীরব তুহিন জ'মে যায়।
রুদ্ধ অভিমান করস্পর্শে যে মোছাতে পারে
সেই অনাবশ্যকতা আমায় একাগ্র রেখে
একদিকে চ'লে গেছে।

অতগুলি বাগানের তীব্র ফল, আমি একা

অস্ত্রের গৌরবহীন
প'ড়ে আছি।

তুমি আজো ভীত আজো রুগ্‌ণ হয়ে ওঠো।
চাঁদরের নিরুপম তপ্ত দুঃখে শিমুলের মতো
তোমায় আচ্ছন্ন রাখি, হে বিষণ্ন মহত্ত্বরহিত মাতা
তোমাকেও।

অতিশয় প্রেম নানাদিকে যায় পথিকের।
মম স্তব্ধ লোভ তবু গ্রীস যেন অমল মুকুট তুলে ধরে
অতগুলি বাগানের তীব্র ফল, আমি একা
অস্ত্রের গৌরবহীন
প'ড়ে আছি।

আঁচলের খুঁট ধ'রে গ্রাস করবো

আঁচলের খুঁট ধ'রে গ্রাস করবো ও ভয়াল দেহ
সমস্ত কাপড়-সুদ্ধ পিঠময় ছড়ানো সংক্রাম
চুলের।
কী করবে তুমি ? অলস প্রস্থিত রৌদ্রসম
ক্ষেতের সীমায় প'ড়ে বালুকায় রেখে শান্ত মাথা ?
যে-হৃদয় খেতে চাই তারে কি পায় না এইরূপে
কেউ, কোনোদিন, গিলে শক্তিমান রাক্ষসের মতো
অথবা ভূতের মতো স্পর্শে-স্পর্শে বাষ্পীভূত ক'রে
কিছুতেই—
সে কি থাকে ভগবান তোমার ভিতর ?

ভুলে যাবো একদিন, এ-কথার স্পর্ধা থাকে থাক্
ভুলে যেতে হয় যদি তোমাকেও, হে ডুবো শরীর
চাড়া দিয়ে বুকে, নখে-দাঁতে খুঁড়ে ফেলো পিঠভর

উদোম সড়ক, পারো চ'লে যেয়ো ক্রুর হাত ধ'রে।
কী তবু কামনা বাকি, আজো কেন তৃষ্ণা নাহি সরে—
কিছুতেই,
সে কি থাকে ভগবান তোমার ভিতর ?

প্রেম

অবশ্য রোদ্দুরে তাকে রাখবো না আর
ভিন্‌দেশি গাছপালার ছায়ায় ঢাকবো না আর
তাকে শুধুই বইবো বুকের গোপন ঘরে
তার পরিচয় ? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

চিরটাকাল সঙ্গে আছে—জড়িয়ে লতা
শাখার, বাহুর নিমন্ত্রণকে ব্যাপকতা
বলার সময় হয় নি আজো ক্ষেমংকরে—
তার পরিচয় ? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

গোপন রাখলে থাকবে না আর—বাইরে যাবে
পারলে হৃদয় দুর্বলতা দেশ জ্বালাবে
মিছেই আমায় জব্দ করে
তার পরিচয় ? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে

দেয়ালির আলো মেখে নক্ষত্র গিয়েছে পুড়ে কাল সারারাত
কাল সারারাত তার পাখা ঝরে পড়েছে বাতাসে
চরের বালিতে তাকে চিকিচিকি মাছের মতন মনে হয়
মনে হয় হৃদয়ের আলো পেলে সে উজ্জ্বল হতো।

সারারাত ধরে তার পাখাঝসা শব্দ আসে কানে
মনে হয় দূর হতে নক্ষত্রের তামাম উইল
উলোট-পালোট হয়ে পড়ে আছে আমার বাগানে।

এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন
পৃথিবীর সমস্ত রঙিন
পর্দাগুলি নিয়ে যাবো, নিয়ে যাবো শেফালির চারা
সোলাবাড়ি থেকে কিছু দূরে রবে সূর্যমুখী-পাড়া
এবার তোমাকে নিয়ে যাবো আমি নক্ষত্র-খামারে নবান্নের দিন।

যদি কোনো পৃথিবীর কিশলয়ে বেসে থাকো ভালো
যদি কোনো আন্তরিক পর্যটনে জানালার আলো
দেখে যেতে চেয়ে থাকো, তাহাদের ঘরের ভিতরে—
আমাকে যাবার আগে বলো তা-ও, নেবো সঙ্গে করে।

ভুলে যেয়োনাকো তুমি আমাদের উঠানের কাছে
অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে।

যখন বৃষ্টি নামলো

বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো
কূল ছেড়ে আজ অকূলে যাই এমনও সম্বল
নেই নিকটে—হয়তো ছিলো বৃষ্টি আসার আগে
চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, তাই কি মনে জাগে
পোড়োবাড়ির স্মৃতি ? আমার স্বপ্নে-মেশা দিনও ?
চলচ্ছক্তিহীন হয়েছি, চলচ্ছক্তিহীন।

বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন-পানে একা
ছুটে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমায় পাবো দেখা

হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলিগাছের তলে
আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে
কিন্তু তুমি নেই বাহিরে—অন্তরে মেঘ করে
ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে !

মনে পড়লো

মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে
বাঁশি বাজলো হঠাৎই জংশনে
লেভেল-ক্রশিং—দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
এখন তুমি পড়ছো কি হার্ট ক্রেন ?

দেড়শো মাইল পেরিয়ে গেলাম কাছে
বললে তুমি, এমন করলে বাঁচে
ঐ সামান্য বিদ্যাদানের টাকা !
সত্যি, পকেট—ইঁদুর বাদে, ফাঁকা।

এমন সময় বুদ্ধি দিলে ভারি
বসেছিলাম চাঁদের আড়াআড়ি
বললে, এই যে—রাখো তোমার কাছে।
তোমার ছবি আমার বাক্সে আছে।

মনে পড়লো, তোমায় পড়লো মনে
বাজলো বাঁশি হঠাৎই জংশনে
লেভেল-ক্রশিং—দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন
অনাবশ্যক পড়ছো কি হার্ট-ক্রেন ?

এবার হয়েছে সন্ধ্যা

এবার হয়েছে সন্ধ্যা। সারাদিন ভেঙেছো পাথর
পাহাড়ের কোলে
আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলো শালের জঙ্গলে
তোমারও তো শ্রান্ত হলো মুঠি
অন্যায় হবে না—নাও ছুটি
বিদেশেই চলো
যে-কথা বলোনি আগে, এ-বছর সেই কথা বলো।

শ্রাবণের মেঘ কি মন্থর!
তোমার সর্বাঙ্গ জুড়ে জ্বর
ছলোছলো
যে-কথা বলোনি আগে, এ-বছর সেই কথা বলো।

এবার হয়েছে সন্ধ্যা, দিনের ব্যস্ততা গেছে চুকে
নির্বাক মাথাটি পাতি, এলায়ে পড়িব তব বুকে
কিশলয়, সবুজ পারুল
পৃথিবীতে ঘটনার ভুল।
চিরদিন হবে
এবার সন্ধ্যায় তাকে শুদ্ধ করে নেওয়া কি-সম্ভবে?

তুমি ভালোবেসেছিলে সব
বিরহে বিখ্যাত অনুভব
তিলপরিমাণ
স্মৃতির গুঞ্জন—নাকি গান
আমার সর্বাঙ্গ করে ভর?
সারাদিন ভেঙেছো পাথর
পাহাড়ের কোলে
আষাঢ়ের বৃষ্টি শেষ হয়ে গেলো শালের জঙ্গলে

তবু নও ব্যথায় রাতুল
আমার সর্বাংশে হলো ভুল
একে একে
শ্রান্তিতে পড়েছি নুয়ে। সকলে বিদ্রূপভরে ভাখে।

আনন্দ-ভৈরবী

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উঠানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।

আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে
কাঁদে না মোহনবাঁশিতে বটের মূল
এখনো বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে
বিদ্যুৎ-রেখা মেলে

সে কি জানিত না এমনি দুঃসময়
লাফ মেরে ধরে মোরগের লাল ঝুঁটি
সে কি জানিত না হৃদয়ের অপচয়
কৃপণের বামমুঠি

সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী
তত বিখ্যাত নয় এ-হৃদয়পুর
সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি
আনন্দ সমুদ্দুর

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা

উত্তানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।

অবনী বাড়ি আছো

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো ?'

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—
'অবনী বাড়ি আছো ?'

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
বাথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
'অবনী বাড়ি আছো ?'

চাবি

আমার কাছে এখনো পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে-যাওয়া চাবি
কেমন করে তোরঙ্গ আজ খোলো ?

খুৎনি-পরে তিল তো তোমার আছে
এখন ? ও মন, নতুন দেশে যাবি ?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো।

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো—
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা ?

অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা ?

ঝাউয়ের ডাকে

ঝাউয়ের ডাকে তখন হঠাৎ মনে আমার পড়লো কাকে
রাত্রিবেলা
উপকূলের সঙ্গে চলে স্রোতের খেলা
দাঁতার কাটে স্রোতের জলে চাঁদের নরম
দুখানি হাত
লাইটহাউস দেখায় আলো, দূরগগনের জলপ্রপাত
গতবছর এসেছিলাম, বুকের মধ্যে বেসেছিলাম
তোমায় ভালো
এখন সন্ধ্যা হয়েছে ঘোর, কেবল মেঘে-মেঘে-মেঘেই
দিন ফুরালো
এখন নিথর রাত্রিবেলা
জলের ধারে কেবলি হয় জলের খেলা
অবর্তমান তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে
আমায় গভীর রাত্রে ডাকে
ও নিরুপম ও নিরুপম ও নিরুপম…

স্থায়ী

রেখেছিলাম পদচ্যুত নূপুরখানি
যখন তুমি চাইবে আনি
অনন্যোপায়—দিতেই হবে
অনুভবে
অবিনশ্বর থাকবে কেবল পা দুখানি ।
নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা
সে দিতে চায় লিখনিকা
মরণপ্রিয়—যেতেই হবে
অনুভবে
আভূমিভঙ্গ থাকবে তোমার পা দুখানি ।

জুলেখা ডব্‌সন

ছিলো অনেক রাজার বাড়ি চকমিলানো হাজার গাড়ি
এবং হ্রদে সোনালি অগণন
হাঁসের দল দোলায় পাখা তবু তোমার সঙ্গে থাকা
চমৎকার জুলেখা ডব্‌সন
ঈশানকোণে অমনোযোগে মেঘের ঝুঁটি ধরেছে রোগে
দুমড়ে পড়ে প্রবলা শালবন
চাঁদ উঠেছে অন্তরীক্ষে মনোস্থাপন করি ভিক্ষে
তোমার জন্যে জুলেখা ডব্‌সন ।

হৃদয়পুর

তখনো ছিলো অন্ধকার   তখনো ছিলো বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার   চলিতেছিলো খেলা
ডুবিয়াছিলো নদীর ধার   আকাশে অধোলীন
সুষমাময়ী চন্দ্রমার   নয়ান ক্ষমাহীন
কী কাজ তারে করিয়া পার   যাহার ভ্রূকুটিতে
সতর্কিত বসুধার   প্রহরা চারিভিতে
কী কাজ তারে ডাকিয়া আর   এখনো, এই বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার ফুরালে ছেলেখেলা ?

আমি স্বেচ্ছাচারী

তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
'জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিলো বাড়ি ?'
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী।'

সমুদ্র কি জীবিত ও মৃতে
এভাবে সম্পূর্ণ অতর্কিতে
সমাদরণীয় ?
কে জানে গরল কিনা প্রকৃত পানীয়
অমৃতই বিষ !
যেথায় ভিতর শ্রান্তি বাড়ে অহর্নিশ।
তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
'জলে ভেসে যায় কার শব
কোথা ছিলো বাড়ি ?'
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী।'

হলুদবাড়ি

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি, সামান্য তার উঠান
ইটের পাঁচিল জাফরি-কাটা সিঁড়ি
এই সমস্ত—গড়েছে মিস্তিরি।

বাড়ির ওপর তার যে ছিলো কী টান
মুখের মতো রাখতো পরিপাটি
যাতে বিফল বলে না, বিচ্ছিরি
কিংবা শূন্য সম্মেলনের ঘাঁটি

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি—যেখানে মেঘ করে
এবং দোলে জাফরি-কাটা সিঁড়ি
ভাগ্যবিহীন, তুচ্ছ আড়ম্বরে।

হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যাবেলা সড়ক
কাঁপিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো দক্ষিণে
দৌড়ে এলো সন্ধ্যা যেথায় সড়ক
নিলেন তিনি সকল অর্থে কিনে।

লোকালয়ের বাহির দিয়ে সিঁড়ি
বদল করে দিলো না মিস্তিরি।

সরোজিনী বুঝেছিলো

দুপুরে আঁধার ঘর—মেঘে ঢাকা বিস্তৃত আকাশ
সরোজিনী চুরি করে নিয়ে যায় শাদা রাজহাঁস
হয়তো বা বৃষ্টি হবে, হয়তো বহিবে হাওয়া বেগে
মুখের অগ্নি কি তবে সরোজিনী ঢেকেছিলো মেঘে ?
মাঠের উপরে শাদা হাঁসগুলি চরেছিলো একা
সরোজ ঘরেই ছিলো—শুধু তার চোখ মেলে দেখা
এই সব হাঁসেদের—বৃষ্টির সূচনা দেখে নেবে
জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে হাঁসে-ফাঁসে—কাপড়ের প্রেমে
শুধু চোখ মেলে দেখা, এই হাঁস স্পর্শ করা নয়
সরোজিনী বুঝেছিলো, শুধু তার বোঝেনি হৃদয়।

কোনোদিনই পাবে না আমাকে

চন্দ্রমল্লিকার মাংস ঝরে আছে ঘাসে
'সে যেন এখনি চলে আসে'
হিমের নরম মোম হাঁটু ভেঙে কাৎ
পেট্রলের গন্ধ পাই এদিকে দৈবাৎ

কাছাকাছি
নিজের মনেরই কাছে নিত্য বসে আছি
দেয়ালে দেয়ালে
হাটের কাচকড় কুপি অনেকেই জ্বালে

নিভন্ত লণ্ঠন
অস্তিত্ব সজাগ করে বারান্দার কোণ
বসে থাকে
'কোনদিন পাবে না আমাকে—
কোনদিনই পাবে না আমাকে !

বিষ-পিঁপড়ে

সারা শরীর জুড়ে তোমার বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম
আস্তে, যেমন আমরুলে, ঐ নীল ভিজানো গাছের ছালে
ছড়িয়ে দিলুম যেমন চাষা ছড়িয়েছিলো পুকুর বীজ
ক্ষেত ভরে যার শস্য ওঠে, তোমার শস্য শরীর ভরে
কুড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ কেন বিষ-পিঁপড়ে ছড়িয়ে দিলুম—
কারণ ছিলো ? কারণ আছে ? তালস্থপুরি গাছের কাছে
কারণ ছিলো—কারণ আছে।

ঐখানে গোপন ডুবুরি তোমার জলে স্নান করেছে।
সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে আছে তোমার দেওয়া কুসুম-গন্ধ
হলুদ তোমার হলুদ, এই কি সারাজীবন সন্ধ্যাবেলার
সঙ্গ দেওয়া ? ভবিষ্যতের ঘর-বাঁধা খড় খুঁজতে যাওয়া ?
এই কি তোমার রাত পোহানো, পথিককে পথ দেখিয়ে আনা ?
এই কি তোমার প্রতিচ্ছবি, যে ছিলো বুক ভরিয়ে, ব্যেপে—
আপাদমাথা সারা শরীর—তাই শরীরে ছড়িয়ে দিলুম
সর্বনাশা বিষের যাদু, লুট করে হাড় ভাঙতে বাকি
ওরাই আমার সেনাবাহিনী, আমাকে সৎ সিংহাসনে
বসিয়ে রাখে সারাজীবন—

তবু আমার দুঃখ, দুঃখ হঠাৎ ঘরে ঢুকলো একা—
নও তুমিও সঙ্গিনী তার, সে এক শতরঞ্চি বেড়াল
খাটের বাজু জড়িয়ে দাঁড়ায়—তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে—
অন্ধ গলায় চেঁচিয়ে বলে, 'আমিই কঠোর সঙ্গিনী তোর।'

নীল ভালোবাসায়

আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে
তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, আঁধার-সমুদ্রে নৌকা
যেমনভাবে বেঁচে ফিরতো—তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম
আমি সোনার একটি মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে।
হঠাৎ ছুরি দৌড়ে এলো—হাতের মুঠো জব্দ করে
আঁধারে চালাতে বললো, যেমনভাবে মারে বৈঠা
সুখে ওপার হেঁকে বলছে দুঃখমোচন করতে এসো
আমার পদ্মদীঘির কাছে শান-বাঁধানো ঘাটটি আছে
সেখানে কেউ কাপড় কাচে, দুঃখগ্লানি তুচ্ছ হলো—
নেশা আমার লাগলো চোখে, কে তুই মাছি দুঃখদায়ক
আমাকে বাঁধনে বেঁধে ফেলে রেখেছিস তোর কোটরে
হেঁটোয় কাঁটা—ওপরে কাঁটা, এই কি দীর্ঘ জীবনযাপন ?
এই রোমাঞ্চকর যামিনী, হায় মাছি তুই সোনার বরন !
খুন করেছি হঠাৎ আমি বাঁচবো বলে একা-একাই
দূর সমুদ্রে পাড়ি দেবোই, পাহাড়চুড়োয় থাকবো বসে
চিরটা কাল চলবো ছুটে—পিছনে নেই, পশ্চাতে নেই
তদন্তে ক্রূর পায়ের শব্দ, আমায় ওরা ছেড়ে দিয়েছে

ছেড়ে দিয়েছে বলেই আমি সোনার মাছি জড়িয়ে আছি
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি
এই রোমাঞ্চকর যামিনী—সোনায় কোনো গ্লানি লাগে না
খুন করে নীল ভালোবাসায় চক্ষুদ্বয় জড়িয়ে গেলাম !

যেতে-যেতে

যেতে-যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ !
ঠাট্টা-বট্‌কেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন ?

সব দিকেই যাওয়া চলে
অন্তত যেদিকে গাঁ-গেরাম-গেরস্থালি
পানাপুকুর, শ্যাওলা-দাম, হরিণমারির চর—
সব দিকেই যাওয়া চলে
শুধু যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকানো যাবে না
তাকালেই চাবুক
আকাশে চিড়, ক্ষেত-ফাটা হাহা-রেখা
তার কাছে ছেলেমানুষ।
ঠাট্টা-বট্‌কেরা নয় হে
যাবেই যদি ঘন-ঘন পিছন ফিরে তাকানো কেন ?

যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই, বিচার-বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই—

যেতে-যেতে এক-একবার পিছন ফিরে তাকাই, আর তখনই চাবুক
তখনই ছেড়ে যাওয়া সব
আগুন লাগলে পোশাক যেভাবে ছাড়ে
তেমনভাবে ছেড়ে যাওয়া সব
হয়তো তুমি কোনদিন আর ফিরে আসবে না—শুধু যাওয়া

যাত্রী তুমি, পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই, বিচার বিশ্লেষণ তোমার নয়
তোমার নয় কূট-কচাল, টানাপোড়েন, সর্বজনীন মৌতাত, রাধেশ্যাম
যাত্রী তুমি—পথে-বিপথে সবেতেই তোমার টান থাকবে
এই তো চাই।

পাখি আমার একলা পাখি

হলুদ পর্দা ছিঁড়ে ফেলতে এক মুহূর্ত সময় লাগবে—
তার পরে লুট—প্রভুর পায়ের কাছেই কি বাতাসা পড়ছে ?
মালসা-ভোগের সময় মানায় অন্ধ হাতে ধুলোর মুঠি ?
জিভ হলুদ বাসনার কাঠি, তাতেই খাঁচা তৈরি হতো—
পাখি আমার একলা পাখি, একলা-কেকলা দুজন পাখি।

স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়ায়
বাদুড় তুমি একলা পড়ো, আমি দাঁতেই কাটছি সুতো
ঢুকবো সমুদ্দুর-লেগুনে—নীল জলে লুটোচ্ছে মোহ
আধভেজা ফুল-শায়ার মতন, সেই শায়াতে জড়িয়ে আছে
জল, জেলি, লোভ, রক্ত আমার—
পাখি আমার একলা পাখি, একলা-কেকলা দু-জন পাখি।

বাবার হাতে তৈরি আমি, এক মুহূর্তে ভাঙবো পিঠের
উল্টে-রাখা সাধের সিন্দুক—মোহর মেজের পড়বে ঝরে
নীল জলে লাল পাথরকুচি আষ্টেপৃষ্ঠে আলিবাবার
আমি একটি সোনার মাছি মাড়িয়ে ফেলবো রাতদুপুরে
স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জলের তৈরি শক্ত বেড়ায়
বাদুড় তুমি একলা পড়ো—আমি সিন্দুকে সাঁতার কাটছি।

পাখি আমার একলা পাখি, একলা-কেকলা দুজন পাখি
লাগছে ভালো—সারাজীবন খাঁচার মধ্যে, বাসনা-কাঠি

ঘিরে রেখেছে স্তাংটো শরীর—এদেশে কাপাস ফলে না
খাদ্য-জলের নেই ব্যবসায়, তাই গুতু-পেচ্ছাপের ভক্ত
সব শরীর ঠুকরে খেয়েও দু-জোড়া ঠোঁট বাঁচিয়ে রাখা
নোংরা পাখি, নোংরা পাখি—নোংরা-ঠোংরা দুজন পাখি ॥

তোমার হাত

তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে
এই দেশে বসতি করে শান্তি শান্তি শান্তি
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে
সফলতার দীর্ঘ সিঁড়ি, তার নিচে ভুল-ভ্রান্তি
কিছুই জানতে পারিনি আজ, কাল যা-কিছু আনতে
তার মাঝে কি থাকতো মিশে সেই আমাদের ক্লান্তির
দু-জন দু-হাত জড়িয়ে থাকা—সেই আমাদের শান্তি ?
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে।

বেশ কিছুদিন সময় ছিলো—সুদুঃসময় ভাঙতে
গড়তে কিছু, গড়নপেটন—তার নামই তো কান্তি ?
এ সেই নিশ্চেতনের দেশের শুরু না সংক্রান্তি—
তোমার হাত যে ধরেইছিলাম তাই পারিনি জানতে ॥

এই বিদেশে

এই বিদেশে সবই মানায়—
পা-চাপা প্যান্ট, জংলা জামা
ঘোমটুরন্ত গলার রুমাল, সঙ্গে থাকলে অশথামা
এই বিদেশে সবই মানায়।

ব্রায়ার-পাইপ, তীক্ষ্ণ জুতো
নাকের গোড়ায় কামড়ে-বসা কালো কাচে রোদের ছুতো
এই বিদেশে সবই মানায়।

কিন্তু তোমার তালছড়িটা—
মেঘে মেদুর সেই যে বক্ষে বাস্তুভিটা
যেখান থেকে বাকি জীবন করবে শুরু বলেই এলে—
সেইখানে আজ অভয় পেলে

এই বিদেশে সবই মানায়॥

সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়

পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়—(আরো অনেক কিছু ?)—তারও আগে
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা, বুকের ভিতরে বুক
আর কিছু নয়।
'হ্যাণ্ডস্ আপ'—হাত তুলে ধরো—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে যায়
কালো গাড়ির ভিতরে আবার কালো গাড়ি, তার ভিতরে আবার কালো গাড়ি
সারবন্দী জানলা, দরজা, গোরস্থান—ওলোটপালোট কঙ্কাল
কঙ্কালের ভিতরে শাদা ঘুণ, ঘুণের ভিতরে জীবন, জীবনের ভিতরে
মৃত্যু—সুতরাং

মৃত্যুর ভিতরে মৃত্যু
আর কিছু নয়!
'হ্যাণ্ডস্ আপ'—হাত তুলে ধরো—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ
তোমাকে তুলে নিয়ে যায়
তুলে ছুঁড়ে ফেলে গাড়ির বাইরে, কিন্তু অন্য গাড়ির ভিতর
যেখানে সব সময় কেউ অপেক্ষা করে থাকে—পলেস্তারা মুঠো করে
বটচারার মতন
কেউ-না কেউ, যাকে তুমি চেনো না
অপেক্ষা করে থাকে পাতার আড়ালে শক্ত কুঁড়ির মতন
মাকড়সার সোনালি ফাঁস হাতে, মালা
তোমাকে পরিয়ে দেবে—তোমার বিবাহ মধ্যরাতে, যখন ফুটপাত বদল হয়
—পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে
দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ।
মনে করো, গাড়ি রেখে ইস্টিশান দৌড়ুচ্ছে, নিবন্ত ডুমের পাশে তারার আলো
মনে করো, জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির—আকাশ-পাতাল এতোল-বেতোল
মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পালকি ছুটেছে নিমতলা—পরপারে
বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ—

সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়
তখনই
পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা, বুকের ভিতর বুক
আর কিছু নয়॥

বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে

বহুদিন বেদনায়, বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদ্‌ঘাটন
সে-সময়ে পর্দা সরে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে—
যে-সময়ে মেহগনি খাট ডুবে যায় মেঘে-মেঘে
যে-সময়ে মনোহর প্রত্যভিবাদন নিতে ধানক্ষেতে নেমে আসে চাঁদ
অন্ধকার অবহেলা অন্ধকার বড়ো বেদনার—
যে-সময়ে হৃদয়েরই উদ্‌ঘাটনে ভাসে মুখবাঁধা ঈগলবকের ঝাঁক একই দলে,
হলুদ পাতায় ভরে যায় নন্দীদের বটতলা,
সে-সময়ে তোমাদের বাড়ির কাউকে দেখা গেলে
(এমনকি অতিচেনা রোমশ বিড়াল !)
সিন্ধুরের ফোঁটা তার কপালে দিতাম এঁকে, তবে
তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিতে সময়সংকেত—
সেই লোকটির হাতে এ-ফোঁটা পরানো হয়েছিলো।

অতি আদরের পথে গলির বারান্দা ভালোবেসে
শেষবার সেই লোক কাহাদের বিড়ালেরই সাথে
করিয়াছে মুখোমুখি দেখা !
অবহেলা তোমাদের, অবহেলা তাহার তো নয়—
অমর নারীর মতো তোমরা করিতে পারো খেলা,
তাহাদের সে-সময় আছে ?
ঐ তো সেদিন আমরা আমাদেরই জন্মদিনে করেছি গ্রহণ—
বয়সের পরচুলা।

বয়স তো কারো একা নয় ?
বয়স দাঁড়িয়ে থাকে কোনো মাঠে স্কেলকাঠি হয়ে—
মানুষ মাপিতে যায়, মানুষী মাপিতে যায়, বালকেরা হাসে—
৫"-৩"-এ হয়ে যায় মনোরমা কাপ নির্বাচন !
বহুদিন বেদনায়, বহুদিন অন্ধকারে হয় হৃদয়ের উদ্‌ঘাটন
সে-সময়ে পর্দা সরে যায় প্রাচী দিগন্তের দিকে।

স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট, তুমি

স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে, গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট তুমি—
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার—ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
তোমায় নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করে আমি
মহান খেলনায় গিয়ে পৌঁছুলাম
এ-বয়স খেলনার নয়, হেলাফেলা সারাবেলার নয়,
রবীন্দ্রনাথের মতন নয় গঙ্গাস্তোত্রে গা ভাসানো
আমার সুসময় দুঃসময় দুটোই অল্প
রেলগাড়ির ব্রিজ আর কতোটুকু ? আমি সেই ব্রিজের মতন
অল্পসল্প হাহাকার—ক্রকলীন ব্রিজ
নই হার্ট ক্রেন আমেরিকান কবির
মিটিঙে সবাই বলে, আমি তোমাকে ট্রেনের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলাম
অথচ তুমি জানো সবই—আমাদের মিল-মিলন হবার নয়
তুমি দূর ছায়ার মধ্যে গণ্ডোলায় ভেসে বেড়াচ্ছো
আমার স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট,
আষ্টেপৃষ্ঠে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট ইটকাঠের স্তূপ
রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার—ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে।

প্রথম ফুল ফোটার দিনে একঝলক কিশোরীর আলুস্থালু
অলিগলি পেরিয়ে পেয়েছিলাম তোমার, কবিতার
সিঁড়ি—একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি—যা কোনোদিন
প্রাসাদে পৌঁছায় না
শুধুই সিঁড়ি, একলা অবাক নির্জন সিঁড়ি আর
কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো—
দূর ছাই ! কি পাগলের মতন আবোলতাবোল—
কবিতা লেখার কথা আমার

সিঁড়ির কথা রাজমিস্তিরির, হলুদবাড়ি—তাও রাজমিস্তিরির
কবিতা লেখার কথা আমার
স্বপ্নের মধ্যে, শুধুই স্বপ্নের মধ্যে গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট তুমি—
ইটকাঠের স্তূপ রাজস্থানী মার্বেল
তুমি উদার—ঠিকঠাক শপথ রেখেছিলে
হাতের পরে মাথা রেখেছিলে, দুই উরু ভরে রেখেছিলে কার্পাস
শুধু চীনেবাদামের খোসা ছাড়ানো আমার কবিতার সঙ্গে
মিশ খাচ্ছে না
এয়ারকণ্ডিশনিং-এর ক্ষেত্রেও বাদামের খোসা নিষিদ্ধ! চুম্বন নিষিদ্ধ
তাম্রকূট আইন ক'রে বন্ধ করা, দূর ছাই!
কবিতার কাছে যতো কথা জড়ো করছি ততোই ছড়িয়ে পড়ছে
তোমার-আমার মনের স্বপ্নের সাধের মতন—বাতাস নেই,
গাবভেরেণ্ডার পাতা নড়ছে না—জোয়ারের জল
তবু ছড়িয়ে পড়ছে, শুধুই ছড়িয়ে পড়ছে।

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভ'রে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
অই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
আমি দেখছি, কেবল অনবরত ওরা খুঁটে চলেছে
বকের মতো নিভৃতে মাছ
এমন অসম্ভব রহস্যপূর্ণ সতর্ক ব্যস্ততা ওদের—
আমাদের পোস্টম্যানগুলির মতো নয় ওরা
যাদের হাত হতে অবিরাম বিলাসী ভালোবাসার চিঠি আমাদের
হারিয়ে যেতে থাকে।

আমরা ক্রমশই একে অপরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি

আমরা ক্রমশই চিঠি পাবার লোভে সরে যাচ্ছি দূরে
আমরা ক্রমশই দূর থেকে চিঠি পাচ্ছি অনেক
আমরা কালই তোমাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে ভালোবাসা-ভরা চিঠি
ফেলে দিচ্ছি পোস্টম্যানের হাতে
এরকমভাবে আমরা যে-ধরনের মানুষ, সে-ধরনের মানুষের থেকে সরে
যাচ্ছি দূরে
এরকমভাবে আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি নিজেদের আহাম্মুক দুর্বলতা
অভিপ্রায় সবই
আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের দেখতে পাচ্ছি না আর
বিকেলের বারান্দার জনহীনতায় আমরা ভাসতে থাকছি কেবলি
এরকমভাবে নিজেদের জামা খুলে রেখে আমরা একাকী
ভেসে যাচ্ছি বস্তুত জ্যোৎস্নায়
অনেকদিন আমরা পরস্পরে আলিঙ্গন করিনি
অনেকদিন আমরা ভোগ করিনি চুম্বন মানুষের
অনেকদিন গান শুনিনি মানুষের
অনেকদিন আবোলতাবোল শিশু দেখিনি আমরা
আমরা অরণ্যের চেয়েও আরো পুরোনো অরণ্যের দিকে চলেছি ভেসে
অমর পাতার ছাপ যেখানে পাথরের চিবুকে লীন
তেমনই ভুবনছাড়া যোগাযোগের দেশে ভেসে চলেছি কেবলই—
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছে ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
অই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
একটি চিঠি হতে অন্য চিঠির দূরত্ব বেড়েছে কেবল
একটি গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব-বাড়তে দেখিনি আমি।

স্মরণিকা

৯. বি দিলীপকুমার সেনের স্মৃতি

এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো
তুমি সকলের কানে কানে বলতে এসেছো
নির্বাচন করে দিতে এসেছো ইস্টিশান আর রেল-গাড়িতে
তোমার কপাল আর পাথরের মুখ টেলিগ্রাফের তারে গাঁথা
তুমি কখনো সাহারানপুরের পোস্টবাক্সে ফেলোনি চিঠি
তুমি কখনো ইঁদুর মারোনি সেঁকোবিষে
কখনো তুমি ময়দানের পাথরের ঘোড়া জড়িয়ে ধরে আক্রমণ
করোনি চীন

এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার হলুদ চুলের রাশি
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো।

সে-রাতে ঝলক বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিলো ঘাটের রানা
ভোর নাগাদ বট আর যজ্ঞডুমুর মাটিতে পড়ে ফেটে
যাচ্ছিলো অবধারিত শব্দে
সুপারি গাছের ডানা খসে যাচ্ছিলো হাওয়ায় হঠাৎ
তুমি একটিমাত্র ডুব-সাঁতারে দীর্ঘনিঃশ্বাসে পার হলে অকূল জল
জীবনের বেদনা মরণের বেদনার কাছে ধুলিলুণ্ঠিত হলো।

সেবার আমরা গণতান্ত্রিক জুলিয়াসের রোমদেশে ঘুরেছি, কতোই
রুশোর বেদে শুয়েছিলো মরুভূমির বালিয়াড়ির গভীরে
আমাদের কাছে
তার পোষা সিংহের ডাক আমরা শুনেছি কালরাতে
আমাদের স্বপ্নের স্টীমারগুলি ভরে গিয়েছিলো রুপোলি মাছে

সোদন বুঝেছিলাম তুমিই সেই আবলুশ সিংহের
পিঠে চড়ে বিদ্যুতের মতো
পৃথিবী এপার থেকে চিড় ধরাবে মার্বেল।

তোমাকে নিয়ে আমি একবার রাসতলায় ঘুরে আসবো ভেবেছিলাম
পথের পাশে ডালিম ফুটেছিল খুব
পৃথিবীতে আমরণ প্রেম আর শয়নঘর ছাড়া কিছু নেই
তোমার কবিতার ভিতর অমানুষিক পরিশ্রম ছিলো
অথচ লুডোর ছকে এককালে ছক্কা ফেলেছিলে
এখন তুমি প্রত্যেক কবির পাশে রয়েছো শুয়ে
বালিশের ঝালরের উপর তোমার চুলের রাশি।
লুটোচ্ছে পাট-খোলা গরদের মতো।

ধীরে ধীরে

ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো
মানুষ মানুষে গাছে গাছ
সিংদরজা আনাচ-কানাচ
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো
ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদলে নেবো

ছেঁড়াখোঁড়া ইজেরের ফুটো
কনুই পর্যন্ত ভাঙা মুঠো

বদলে নেবো
সহজ পোশাকে
আকর্ণবিস্তৃত মুখ ঢাকে
ঠায়সন্ধ্যা পিছল গলির
চলি
চলি, দেখে আসি
বেজেছে আঘাট-ছাড়া বাঁশি
কিনা
কোন্ রাজ্যে রয়েছে নবীনা
বিপ্লব
যেভাবে হোক
বদলে নেবো
বদলে বদলে নেবো।

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি
ঘরদুয়ারের ওপরই ডাকবাক্স
হ্যাঁ, পিছনেও একটা ঘোরানো সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে
তার মন তো আর তোমার মতন পরিষ্কার নয়
সপ্তাহান্তে মেথরের বন্দোবস্তটাও পাক্কা!
মোটের ওপর, চলনসই করে রাখাটার নামই জীবন
এই তো জানি
উদোমাদা চণ্ডীচরণ
যা হাতে দেয় তাতেই মরণ।
সেরকম কিছু নয় সে—
বরং ছেঁড়া কাঁথা ফর্সা করে, ছিন্নভিন্ন খুঁট কাঁখে গুঁজে
খল্‌বল্ হাঁটায় দুরন্ত।
সাঁতারের ব্যাপারটাও মনে রেখেছে।

সুতরাং তাকে আমি কিছুতেই দোষ দিতে পারি না
দোষ নয় তো যেন সাবান
হাতে তুলে গায়ে মাখার অপিক্ষে।

সে, মানে একটা বাগানঘেরা বাড়ি—আগেভাগেই ব'লে রেখেছি
ঘরদুয়ারের ওপরটায় ডাকবাক্স
ফিরিঅলা থেকে ডাকপিওন তাকে ছেড়ে সব্বাই
নট্ নড়ন-চড়ন ঠকাস্—
মরণ আর কি ! দু-পা এগিয়ে ছাখ না বাপু
আমার জায়গাটায় আবার দাঁড়িয়ে ভিড় করা কেন ?

কাল রাতে জাগিয়ে রেখেছিলো আমায় পুরানো চাঁদ

কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমককে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরানো চাঁদ
পাল্লাদাস ক্ষণে ক্ষণে আমায় সেই স্বপ্নছায়াময় ঘুম থেকে জাগিয়ে বলেছিলো
এই তো গ্রীসদেশ, এখানে কেউ ঘুমায় না—
তখনই চাঁদ অস্পষ্ট কালো এক ঝিনুকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো
আমার আর গ্রীসদেশ দেখা হলো না—
দেখা হলো না পাল্লাদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে
অসচরাচর গ্রীসের হাজার হাজার বছরের শৌখিন সমাধিস্তবক
বাগানের ফুল
সারারাত অকুণ্ঠ নতুন মৌসুমির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি
মেঘের খাঁজে খাঁজে ছিলো আলো আর আঁধার
রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো
কঙ্কালের পাঁজরের মতো, নতুন ভয়েলের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিলো মেঘ
আমার মাথার উপর
আমার কলগেট ছাদের উপর গোলাপায়রা ছুটি-হওয়া ইস্কুলের মতন
বসেছিলো

এতো আলো, মেঘ এতো, শেফালিতলা ভরে মখমলের মতো এতো
সনির্বন্ধ গাঁদাফুল
আমার ও কাজে লাগলো না আজ
যেমন বিষণ্ণভাবে আমি
যেমন বিষণ্ণভাবে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন করে ব্রাহ্মণ
তেমনভাবে আমার অল্পবিস্তর স্মৃতির সঙ্গে গা ঘষছিলাম আমি
মাঠের গাভী যেমন শিমুল গাছে, কিংবা বেড়াল যেমন মুঠিভরা থাবায়
তেমনভাবে তোমার স্মৃতিগুলি কররেখা আঁচ করার মতো
মুখের উপর তুলে ধরছিলাম আমি
কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরানো চাঁদ
তোমাদের উঠানের সঙ্গে সাগরের এক গোপন বৈঠকে আমি
তরণীমুক্ত যাত্রীর মতো বিহ্বলতায় সরে গিয়েছিলাম
কাল সারারাত ধরে এক অন্ধকার গ্রীসদেশে পাল্লাদাসের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে
কিছুই দেখিনি আমি
কতোদিন সমাধি-প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসেছি
টেলিফোন করে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো বলে বেরিয়ে আর
নিজের সমাধি খুঁজে পাচ্ছি না
যেখানেই দাঁড়াই সবাই বলে—আমিও একা আছি—তুমি ঢুকে পড়ো
কয়েকদিনের জন্য থেকে যাও
কতো লোক তো ভুবনেশ্বরে বেড়াতে যায়—ছুটিছাটায়—
তাদের অনন্ত আতিথ্যে মনে পড়েছিলো তোমাদের কথা কালরাতে
স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে পুরানো চাঁদে
তোমরা সকলেই তোমাদের আপনাপন কবরে শুয়ে রয়েছো
তোমার বোন চারুশীলা পরীক্ষার পর কবরে শুয়ে আমার কবিতা
কাঠি দিয়ে ঘেঁটে দেখছে—
কোথায় ওর দিদির কথা, কোথায় বা ওর দিদির প্রতি তরুণ কবির প্রেম !

একটি তারা দেখে দ্বিতীয় তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে কবর থেকে মুখ বাড়িয়ে—
মঙ্গল করো

কলকাতার মৌলালিতে পাইপের ভেতর অমন মুমূর্ষু দেখেছি আমি অনেক
বৃষ্টির দিনে দেখছে সঞ্চরমান ট্রাম স্টিমারের মতো
কালরাতে এমন অন্ধকার গ্রীসদেশে ঘুরেছি আমি অনেক।

নতুন মৌসুমির পানে হাত পেতে কাল সারারাত আমি চাকুরিপ্রার্থী
চাঁদের প্রতি তাকিয়ে বসে ছিলাম
আমাদের উঠানে ছেলেদের রবারের বল একটি পড়েছিলো
আমাদের উঠানে ইমারত তৈরি হবার উপযুক্ত কড়িবরগা ছিলো পড়ে
আমাদের উঠানে উলোটপালোট খাচ্ছিলো
পাল্লাদাসের সমাধিফলকে দুর্নিরীক্ষ ডার্জ···

কিছুক্ষণ আগে গ্রীস থেকে বেড়িয়ে ফিরলাম আমি
যারা যারা আমায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলো
তাদের সকলের সমাধি আমি অন্ধকারে এসেছি দেখে
এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভরে গিয়েছি আমি
চৌরঙ্গির দশফুট উঁচু দেয়ালের মতো পোস্টারে ভরে গিয়েছি আমি
তোমায় লেখা চিঠি আমার দেড় বছর পরে ফিরেছে কাল—
এপিটাফ এপিটাফ এপিটাফে ভরে গিয়েছি আমি
কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো
আমায় পুরানো চাঁদ।

মজা হোক—ভারি মজা হোক

তোমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবো, ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
এখন একটু চুপটি করে বসে থাকো
আমি একটি হাত টেবিলের তলা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছি, সেই হাতে
ভুবন ধরার মতো তোমার পদতলে ধরে রাখো
আমিও চুপটি করে বসে থাকবো

তুমি আমায় একটা লাল বুলবুলি কিনে দেবে
ঢেউয়ের মতন ঝুঁটি তার
আমরা দুজনে ওদের আদর-আহ্লাদের ফাঁকে ফাঁকে
নাচ-নাচুনি কোঁদল দেখবো।
আমি বিষয়টা খুব নম্রভাবেই শুরু করতে চাই
চুলের টায়রা থেকে শুরু করার উচ্চাভিলাষ আমার নেই
বুলবুলিটা কথার কথা—বলতে হয় বলেই বললুম
ঘুষ-ঘাষের কথা নয় তো।
তবু একটা চেড়ার আড়াল, একটা ফর্ম থাকা ভালো।

তোমার বুক দেখলে আমার মেদিনীপুরের কথা মনে পড়ে
দেশ-গ্রাম নয়—সুদ্ধু ঐ মেদিনী শব্দটা
নাম বদলে মাঝে-মাঝে 'মেদিনীদুপুর' করতেও ইচ্ছে হয়—
দুপুর, মানে দুখানা, দুখানা মানে দু-বুক···

এতো খুলে না বললেও চলতো, চেড়ার আড়াল তো
মোটামুটি পছন্দই করো
তবু আচারের ভিজেল খুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকে সাধ্য কার? একা?
বিষয়ের মুখোমুখি?
সমালোচকের কানে গোঁজা পেন্সিল তক্ষুনি গদ্যপদ্য কাটাছেঁড়া করতে
নেমে আসবে না?
বহুকাল বাদে তোমায় পেয়েছি, তোমায় পেয়ে আমাকেও পেয়েছি
ভারি মজা করার ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু
এসো, দুজনেই আঁধার করা টেবিলের তলে সেঁধিয়ে পড়ি
মজা হোক—ভারি মজা হোক একখানা
যিনি টিকিটে বহু লোককে হাসানো যাক
ঐসব মন-খারাপ মজাদিঘি ব্যাঙ-বাবাজি লোক ঠেকিয়ে
ভীষণ মজা হোক।

মন্দিরে, ঐ নীল চূড়া

মন্দিরে ঐ নীল চূড়াটির অল্প নিচে তিনি থাকেন
একমুঠি আতপের জন্যে ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে রাখেন
দিন-ভিখারি।

অদূরে দেবদারুর সারি
ঘন ছায়ার গুহার দ্বারায় আকাশ ঢাকেন
মন্দিরে, ঐ নীল চূড়াটির অল্প নিচে তিনি থাকেন।

যার যা কিছু
সস্তা, মোটা, উচ্চতাময় কিংবা নিচু
বিঘৎখানেক দীর্ঘ এমন ডাল থেকে তাঁর
এই উপহার সংগৃহীত তুচ্ছ জবার।

সামান্য হয়
তাঁর পূজাতে নষ্ট সময়
এবং তিনি
আমার চেয়ে ভালোবাসেন তরঙ্গিণীর
দু-হাত ফাঁকা, রক্তে মাখা ওষ্ঠ, করুণ—
চায় না ক্ষমা তরঙ্গিণী পাপের দরুন!

মধ্যবর্তী বিষণ্ণতা

একপায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, জনসভার মধ্যে যেমন
বাঁশের দণ্ডে নীল পতাকা, তেমনি একা দাঁড়িয়ে আছি
আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী যেন ঐ মনুমেন্ট আকাশ ফুঁড়ছে—
ফলত, দোষ আমার, আমি প্রেরণাময়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী!

তুমি আমার দোষ ধরেছো—সিঁড়িতে কোন্ কৃপণতার
আভাস মেলে এলে এমন স্বৈরাচারী—কোন্ পথে যাই ?
উঁচু-নিচু দু-পথে কি পথে কি পথিকশূন্য পথের বাঁচাই
তোমার লক্ষ্য ? তাহলে ঠিক মধ্যবর্তী বিষণ্ণতা।
এবার একটি গল্প বলি, গল্প কথার কারসাজিতে
তার আগাপাশ্ তলার সুশ্রী মনোহরণ মর্মঘাতের
গল্প বলি, থম্‌কে থাকো—কোন্‌দিন নিঃসঙ্গে দিতে
সঙ্গ এমন, এক পা তুলে ? সংশয়ী জল বইছে খাতে—

মন্দ তাকি ! মধ্যবর্তী বিষণ্ণতায় পান্‌সি ভারি
তেমনি একা দাঁড়িয়ে আছি, আদেশ্য-মান্য এই আনাড়ি,
দোষ যত থাক্ একটি গুণে সে-সর্বস্ব সমাবৃতই
বাইরে-দূরে যাবার সময় চিরটাকাল সঙ্গে নিতো !

এক অসুখে দুজন অন্ধ

আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ
দীর্ঘ দাঁতের আঘাত ও ঢেউ নীল দিগন্ত সমান করে
বালিতে আধ-কোমর বন্ধ
এই আনন্দময় কবরে
আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।

হাত দুখানি জড়ায় গলা, সাঁড়াশী সেই সোনার অধিক
উজ্জ্বলতায় প্রখর কিন্তু উষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর
আলিঙ্গনের মধ্যে আমার হৃদয় কি পায় পুচ্ছে শিকড়—
আঁকড়ে ধরে মাটির মতন চিবুক থেকে নখ অবধি ?

সঙ্গে আছেই
রুপোর গুঁড়ো, উড়ন্ত নুন, হল্লা হওয়ার মধ্যে, কাছে

সঙ্গে আছে
হয়নি পাগল,
এই বাতাসে পাল্লা-আগল
বন্ধ করে
সঙ্গে আছে…
এক অসুখে দুজন অন্ধ !
আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।

ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে

ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে সমস্ত দিন
পাতায় ডালে জড়িয়ে থাকে এক লহমার হাজার ডাকে
ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে সমস্তদিন…
আর কিছু নেই

স্তব্ধ খামার
কোন্ মহিমায় নবীন জামার
সর্ব অঙ্গ ডুবিয়ে দিতেই
ময়ূর হলেন উচ্চকণ্ঠ ?
সে ধিক্কারে ঝাড়লণ্ঠন
মেজেয় পড়ে ভাঙলো মাটি
আঁধারে, এই বাংলো গভীর—অরণ্য খায় দাঁতকপাটি।

আজ আমি

আজ আমার সারাদিনই সূর্যাস্ত, লাল টিলা—তার ওপর
গড়িয়ে পড়ছে আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ
গড়িয়ে পড়ছে উস্কোখুস্কো ভেড়ার পাল, পিছনে পাঁচন

জলও বা হঠাৎ-ফাটা পাহাড়তলির
কিংবা বৃষ্টি-শেষের রাতে যেমন আসে কবিতার আলুথালু স্বপ্ন,
সোনালি চুল

আজ আমি কিছুতেই আর দেহ ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া—
ফুল দেখলে মায়া জাগে না, কাদা দেখলে বুক আমার ফুটন্ত কেতলির মতন
বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে।
গতকাল পর্যন্ত দিনগুলোর আলাদা কোনো স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ ছিলো না
আয়নার আপন ছায়ার মতন সে ছিলো নাছোড়বান্দা আর ধুরন্ধর
এমন করে ভোগের পাড় থেকে ঠেলতে-ঠেলতে আমায় নিয়ে চলেছিলো
যেখানে ক্রমাগত ঝাঁপ হচ্ছে
নিচে জলন্ত কাতানের মতন ঢেউ, মাছচিংড়ি আর সারবন্দী
পালিয়ে যাবার পথ
ভাগ্যিস, আমি ঘুষি মেরে আয়নাটা ভেঙে ফেলেছিলুম।
বহুকাল বাদে আজ আমার লাগছে ভালো—সারাটা দিনই সূর্যাস্ত,
লাল টিলা—
তার ওপর গড়িয়ে পড়ছে আলখাল্লা-পরা স্মৃতির মেঘ।
আমি আমার চশমাটা পুলিশের চোখে-কানে রেখে বলেছি—
পথটুকু পরিষ্কার রাখো হে
কাজ-কর্মে ভুলচুক আমার আবার তেমন পছন্দ হয় না

আজ আমি কিছুতেই আর ওদের ফেলে উঠে আসতে পারলুম না
পাড়ের কাঁথা, মাটির বাড়ি, নোনা হাওয়া—
সবারই কেমন একটা দেহ-দেহ ভাব আছে, আঁশটে গন্ধ আছে, যা মায়া—

একবার তুমি

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো—
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।

বুকের ভেতরে কিছু পাথর থাকা ভালো—ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি
পাওয়া যায়
সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ঐ পাথরের পাল
একের পর এক বিছিয়ে
যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার, যেন ঢেউ, যেন কুমোরটুলির
সলমা-চুমকি-জরি-মাখা প্রতিমা
বহুদূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত দেখে আসতে পারি।
বুকের ভেতরে কিছু পাথর থাকা ভালো
চিঠি-পত্রের বাক্স বলতে তো কিছুই নেই—পাথরের ফাঁক-ফোকরে
রেখে এলেই কাজ হাসিল—
অনেক সময় তো ঘর গড়তেও মন চায়।

মাছের বুকের পাথর ক্রমেই আমাদের বুকে এসে জায়গা করে নিচ্ছে
আমাদের সবই দরকার। আমরা ঘরবাড়ি গড়বো—সভ্যতার একটা
স্থায়ী স্তম্ভ তুলে ধরবো।
রুপোলি মাছ, পাথর ঝরাতে-ঝরাতে চলে গেলে
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।

অবসর নেই—তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না

তোমাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবো
সারা জীবন তুমি তার পাতা গুনতে ব্যস্ত থাকবে
সংসারের কাজ তোমার কম—'অবসর আছে' বলেছিলে একদিন
'অবসর আছে—তাই আসি।'

একবার ঐ গাছে একটা পাখি এসে বসেছিলো
আকাশ মাতিয়ে, বাতাসে ডুবসাঁতার দিয়ে সামান্য নীল পাখি তার
ডানার মন্তব্য আর কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলো
'হ্যাঁ আমি তার লেখাও পেয়েছি।'

ক্বচিৎ কখনো ঐ পথে পথিক যায়
আমায় এসে বলে—'বেশ নিঝ'ঞ্ঝাট আছো তুমি যাহোক!'
আমার হিসাবনিকাশ, টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই—তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না।'

সন্ধে হয়, ইস্টিশানের কোমরের আকন্দ ফুলগুলো ফুলে ওঠে
আমার কষ্ট হয় কেমন
আকন্দ-র নাকছাবি তোমায় মানাতো বেশ
'পাতার একটা থোক হিসেব পাঠাতে তৎপর হয়ো—
তাছাড়া, কম দিন তো হলো না তুমি গেছো!'

দুপুররাতের কথা তোমাদের কিছু কানে গেছে
জ্যোৎস্নায় গাছের ভিতরে পা ছড়িয়ে বলো তুমি
'গতমাসে একটা রান্নাঘর তৈরি হবার কথা জানিয়েছিলে
হোটেলের ভাত-ডাল তাহলে আর তেমন পুষ্টিকর নয়?'

জীবনে হেমন্তেই তুমি ছুটি পাবে—
'পুরীতেও যেতে পারো—ফিরতে পথে

ভুবনেশ্বরটাও দেখে এসো,
আবার কবে যাও না-যাও ঠিক নেই—'
আমার হিসাবনিকাশ টানাপোড়েন, আমার সারাদিন
'অবসর নেই—তাই তোমাদের কাছে যেতে পারি না।'

আমরা সকলেই

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের-গল্প বলে গেলো
সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের উঠতে বললো না
কেবল বললো বসে বসে শোনো তোমরা
তোমাদের সেই দিনগুলি যা তোমরা পিছনে ফেলে রেখে এসেছিলে
তা কেউ কুড়িয়ে নেয়নি আর
তুমি টাকা হারিয়ে এসো, পিছন থেকে কুড়িয়ে নেয় অনেকে
পথ হারিয়ে এসো তুমি, সে-পথেই সারিবদ্ধ পথিক চলেছে
মৃতদেহ ফেলে রেখে এসো তুমি,—শকুন শৃগালে ভোগ করেছে মাংস
দরজা খুলে রেখে এসো তুমি—ত্রস্ত মেয়েমানুষ নিয়েছে পিতলের বাসন
বাড়ি ফেলে রেখে এসো তুমি—সমস্ত নৈরেকার, সকলি নৈরেকার !
তুমি ছেঁড়া জামা দিয়েছো ফেলে
ভাঙা লণ্ঠন, পুরোনো কাগজ, চিঠিপত্র, গাছের পাতা—
সবই কুড়িয়ে নেবার জন্যে আছে কেউ।
তোমাদের সেই হারানো দিনগুলি কুড়িয়ে পাবে না তোমরা আর।
তোমরা যতো যাবে ততোই যাবে মৃত্যুর দিকে
বোঝাবে সকলে—ঐ তো জীবন, ঐ তো পূর্ণতা, ঐ তো সর্বাঙ্গীণ সর্বাবয়ব
ঐ তো যাকে বলে সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, ধ্যান, পরমার্থ বিষাদ—

সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের হারানো দিনের গল্প বলে গেলো
তারা কোথা থেকে পেয়েছে বলে গেলো না
স্বীকার করলো না তারা পথ থেকে চুরি করেছে কিনা আমাদের
সেই হারানো স্বপ্নগুলি, স্মৃতিগুলি

তারা আমাদের বলে গেলো হারানো দিনের সেই অনুপম স্বপ্নগুলি স্মৃতিগুলি
আমরা অনুভব করলাম আবার—সেইসব হারানো গল্প
যা আমরা এতাবৎকাল হারিয়ে এসেছি
হারিয়ে এসেছি বনে-প্রান্তরে পুরানো খাতায় শ্লেটে রাসতলায়
নদীসমুদ্রে বেলাভূমিতে পথে ডালে-ডালে টকি হাউসে
হারিয়ে এসেছি ইস্টিশানে খেয়াঘাটে কলকাতায় গ্রামে-গ্রামে
কারুর চুলে কারুর মুখে কারুর চোখে কারুর অঙ্গীকারে—
হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি হারিয়ে এসেছি—ফিরে পাবো না
জেনে কখনো আর
কখনো ফিরে পাবো না সেইসব দিন যা ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রে-হেমন্তে ভরা
সেইসব বাল্যকালের নগ্নতার কান্নার পয়সা-পাবার-দিন
ফিরে পাবো না আর
ফিরে পাবো না আর কাগজের নৌকা ভাসাবার দিন উঠানের
ক্ষণিক সমুদ্রের কলরোলে
ফিরে পাবো না আর ফিরে পাবো না আর ফিরে পাবো না আর
সেইসব জ্যোৎস্নার ঝরাপাতার কথকতার দিন ফিরে পাবো না আর।
সমস্ত সকালবেলা ধরে কারা আমাদের সেইসব হারানো দিনগুলির
কথা বলে গেলো
সকালবেলা তাই আমাদের কোনও কাজ হয়নি করা
আমরা অনন্তকাল এমনি চুপচাপ হারানো দিনের গল্প শুনছিলাম
পুলিশের মতো
আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করছিলাম পুলিশের মতো
আমরা ভাবছিলাম সেইসব হারানো দিনগুলি ফিরে পাবার জন্য
লাকি মিতাকে পাঠিয়ে দেখবো একবার
আমরা বসে বসে এলোমেলো উত্তাল সম্ভাবনার স্বপ্নে এমনি করে
ব্যস্ত রাখছিলাম আমাদের
আমরা এমনি করে সময়ের একের পর এক চড়াই-উৎরাই হচ্ছিলাম পার
এমন সময় তারা বললো—'গাড়ি এসে গেছে, উঠে পড়ো উঠে পড়ো—
এখানে থাকলে বাঘে খাবে তোমাদের'

আমরা তখনই লাফিয়ে লাফিয়ে অনেকে হামাগুড় দিয়ে, হেঁটে
ভবিষ্যৎ-পাড়ির দিকে চলে গেলাম
আমরা সকলেই এখানে বাঘের জিহ্বা এড়িয়ে গিয়ে ওখানের বাঘের
জিহ্বার দিকে চলে গেলাম।

দেখি, কে হারে

পথের দু-পাশে দুটো সরু একরোখা গাছ
যেন যুদ্ধ বাধলেই বুদ্ধি দিতে বসবে
নিজেরা তো নট্ নড়ন-চড়ন ঠকাস্
তাই, পরের কানে ফুসমন্তর ঢালতে ওস্তাদ বাহাদুর
এমনকি, ঐ সূচ্যগ্র মেদিনীর কথাটাও বলতে ভুলবে না
থাক, ওদের কথাটা থাক—
নিজের ব্যাপারটাই ধুয়ে-মুছে বলি।

তোমাদের মধ্যে কেউ সাত-গেঁয়ে আছো নাকি ?
তাহলে, কানে এট্টু তুলো দে বসো বাপু
আমাদের খেতির মূলো—'কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান'
তার নাম দিয়েছিলুম ভালোবেসে—
পাড়াতে ছিলো এক অলপ্পেয়ে ক্ষয়কেশে
কী তার নাম ? নাঃ মনেও পড়ে না
তাহলে, তার কথাটাও থাক
নিজের ব্যাপারটাই একটু খুলে-মেলে বলি

চকদীঘির ঐ যে মুচ্ছুদি খলিল
সে আমায় জানতো
আর সেই যে নেয়েপাড়ার কাস্তু, সেও
তবে, দুজনায় গেছে মরে
আগুপিছু—একে খেলে আগুনে, তো, সে দুশমনকে গোরে

এখন আমিই শালা বাঁচছি
দুটো গাছের একটাকে চাচ্ছি
আমায় ডালে তুলে নাও বাপধন
তারপর, সেখেন থেকে সটান যুদ্ধে পাঠাও
দেখি, কে হারে ?
আমি ? না, ঐ ব্যাটা কেলে-কুষ্মাণ্ড !

পোকায় কাটা কাগজপত্র

পোকায় কাটা কাগজপত্র দেখলে শব্দ মনে পড়ে—ফ্যান্‌জোলেঙ্গা
অর্থবিহীন, কিংবা অর্থে জবরদস্ত
উলঙ্গ কিশোরী তোমার মাই দুটো সন্ন্যাসেই মস্ত
হেন করেঙ্গা, তেন্ করেঙ্গা !

'ফ্যান্‌জালেঙ্গা' শব্দ যেন হাঁ-করা রমণীর মুখেই
চিক্ ঢাকা বারুদের মতন—জোচ্ছনায় বাঘ পেতেছে ওৎ
হাতচিঠি, যা হঠাৎ, তাকে হাফগেরস্ত সুখ-অসুখে
কিংবা তোমার বাহে-বমির কীর্তিনাশা একটানা কোঁৎ
কোথায় যে শব্দ-গঙ্গোত্রী ? দিগ্‌বিদিকে চলছি খুঁজে
উইঢিবি, ক্যাকটাসের মধ্যে হ্যামেলিনের বাঁশির ইঁদুর
ফাঁদ্‌রাফাঁই চাঁদোয়ার মধ্যে দূরদেশী গুম্ফা-গম্বুজে
টেরা চাঁদের মতন কিংবা ফ্যান্‌জোলেঙ্গা—টাকের সিঁদুর

হয়তো আমার লক্ষ জীবন লাগবে নিছক গবেষণার
গায়ে পলেস্তারা পরাতে—আরেক কথা, হোহেনজোলার্ন
পড়লে মনে, ভাবতে বসি, কবিতা কি সত্যি হবার
বিষয় ? নাকি মুদ্দ-ফরাস ঘুরতে গেছে মার্টিন ও বার্ন—

এই মিলেতেই পদ্ম মাটি, অলোকরঞ্জন হলে বাঁচাতেন
কিংবা সুনীল অ্যাংলো-সাক্সন হার ছিঁড়ে একটুকরো মুক্তোয়
আমার পিতাঠাকুর শুনেছি এঁটো হাত নিট্ মন্তে আঁচাতেন
ভোজ্যদ্রব্য বলতে আমার বিউলিডাল, একবাটি সুক্তো।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

৯

ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের
দয়াময়ি, দয়া করো, ভিখারিরে অন্নবস্ত্র দাও
রাখিও না মানহীন উলঙ্গ আলোকে প্রকাশিয়া
লোল তরবারি···বাহ্যপ্রাকৃতিক, নৈরাশে, হাওয়ায়।
লো নিবিড় দিনগুলি বৃথা যায় বহিয়া পবনে—
দয়া করো, আজিকার মুহূর্তমণ্ডিত দিনগুলি
বহি যায়, দয়া করো—ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দাঁড়াও
ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের।
হৃদয়ে অসংখ্যবার বালুকাবেলার 'পরে জল
এসেছিলো, বহুবার—তার পদাঘাত যায় ডাকি—
প্রাতেরো, অ্যাঙ্করহীন, ঘোড়ার অনুজ, সহোদর—
আজিকার দিনগুলি বৃথা যায় বহিয়া পবনে
ওঠো, ক্ষুর গাঁথি সব ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দাঁড়াও
হাস্যকরভাবে, বলো : দয়াময়ি, দয়া করো চিতে!

১০

তোমার পায়ের তল মুছাতে-মুছাতে হাত কাঁপে—
অবিমৃষ্যকারিতার মতো আর কিছু নাই, আহা
তোমার পায়ের তল মুছাতে-মুছাতে হাত কাঁপে
প্রাতেরো হৃদয়হীন, হা প্রাতেরো, শুভ্র মেধাহীন।
একান্ন কুমারী জলে সারিবদ্ধভাবে ভাসি যায়

ওরা ভালোবাসে জল, ওরা ভালোবাসে না প্রান্তরে।
আমাদের, হা প্রান্তরে, উহাদের পদতল নাই
দুইশত চারি হাতে উহারা বিস্তৃত আছে জলে।
যে-বাড়িতে আছি তার পাশের সংকীর্ণ গলিপথে
সময়, বরফ-অলা, হাঁকি যায়—দু-ডাকে আলাদা
করে দেয় আমাকে, ও আমার বাবার প্রান্তরোকে।
যে-বাড়িতে আছি তার উপদ্রুত দু-ঘড়ি জানায়;
দ্বিতীয় প্রভাত, দুই সূর্য, দুই সন্ধ্যা—অন্ধকার
অথচ প্রান্তরো বলে—প্রতিসন্ধ্যা শব্দরূপ পড়ো।

১১

প্রান্তরো, তোমারে প্রিয় ঈর্ষা করি, তুমি বহুদিন
আমার বুকের পাশে ঘুমায়েছো পিঠের উপরে।
আমার গোলাপগুলি খেয়ে গেছো, ভবিষ্যৎ-ভরা
কবিতার খাতাগুলি—স্মরণীয় রুমালের ফাঁক।
তবুও তোমারে কিছু বলি নাই, আত্মসাবধান
করেচি বাবার মতো। দূরদেশে গিয়েছি কখনো।
তুমি কি আর কখনো বহিবে না, বহিব একাকী
দুঃখ ও স্মৃতির ভার, উপরন্তু, তোমারে, দিবসে?
শোনো বেড়াবার গল্প—বহু পুরাতন গল্প নয়—
তোমার অদ্ভুত চোখ চাহিল বারেক মুখপানে:
মুহূর্তে উদ্দিষ্ট তব দেখি কোনো নূতন কবিতা—
কী ভীষণ ভালোবাসা মদীয় কবিত্বে স্নানাহার!
প্রান্তরো তবুও কে'ন্ মায়াবী ভিতরে ডেকে যায়
তুমি যতো খুলে দাও, প্রিয় যাই কেবলি জড়িয়ে!

২৬

সারারাত আমাদের পিছু পিছু ছুটেছে পুলিশ
কেননা, বিকেলে মজা গঙ্গাতীরে সূর্যের হত্যার
একমাত্র সাক্ষী এই আমরা তিন উল্লুক কাঁহাকা

কলকাতার প্রকৃতির অশ্লীল অন্তে চমৎকার
পৌদের জ্বালায় হু-হু করতে-করতে দিক্‌বিদিকহারা
—তবে নাকি কলকাতায় নিরঙ্কুশ প্রাণিহত্যা হবে ?
শিল্প হবে ? তেজারতি কারবার খাওয়াবে ভিখিরিরে ?
মাঙ্গল্য বিদেশ থেকে আনা হবে, হে শিক্ষানবিশ
ন্যূনতম টেলিফোন পৌতা হবে পাহাড়ের শিরে—
পাহাড়বিজয় হবে, যদিবা অজেয় থাকে কেউ !
মানুষ, মানুষ করে একদল কবি তোলে ঢেউ
পুকুরেই—আহাম্মক, চোর, বদমাস লক্ষ্মীছাড়া
সম্রম জানলি না, শুধু লিখে গেলি পদ্য পাতপাত !
আমরা তিনজন কবি কারে লক্ষ্য করেছি দৈবাৎ ?

২৯

শুভ্রতাই শুধু জানি পবিত্র ও অতিব্যক্তিগত।
শুভ্র তুলা উড়ে যায় বাতাসের কাশ্মীরের দিকে—
পশমের মতো যতো ভেড়াগুলি উদাসী চরাও
ক্ষেতের সবুজ তৃণ দেবে না তোমারে আলিঙ্গন।
তুমি ও-তৃণের নও, তুমি নও কার্পাসতূলার
তুমি নও পশমের উষ্ণতার মতন স্বাধীন
তুমি ধর্মপ্রাণ নও ; ভেড়াগুলি শুধু রাখালের
তুমি মায়ামোহভরা বিকালের প্রতিবন্ধকতা।
ওগো মেঘ হতে তুমি মাত্রাহীন করো রক্তপাত
আমার শিহর লাগে ! সকল হত্যারে মনে হয়
অতি ভালোবাসাভরা ঐকান্তিক সাধের পতন—
শেষ নাই, ত্রুটি নাই, অনিমেষ আঁখিগুলি নাই
শুভ্র তুলা উড়ে যায় বাতাসের কাশ্মীরের দিকে—
তুমি শুভ্রতার মতো পবিত্র ও অতিব্যক্তিগত।

৩১

অনেক শেফালি আমি দেখিয়াছি, এ-জীবনে আর
দেখিতে চাহি না কোনো শেফালিরে, শেফালি দেখুক
ঝরিতে-ঝরিতে পারে দেখে নিক্ অপাঙ্গে আমায়
আমি কোনোদিন কিছু দেখিব না, ডুবিয়া মরিব।
অনেক জেব্রার খেলা দেখিয়াছি—ম্যাজিয়ম-লুণ্ঠিত জেব্রার
খেলা দেখি নাই, তার অলৌকিক গায়ের বুরুশ
ঝরে গিয়েছিলো জানি ; মৃত্যু ও স্মৃতির অবধেয়
রূপ ও মুখশ্রী নাই, জীবিতেরই কায়ক্লেশ আছে।
তাই আমি শেফালির, কিছুতেই বকুলের নয় ;
শেফালি ঘড়িতে ঝরে গত মুহূর্তের শুষ্ক কাঁটা
হলুদ বোঁটার জোরে করে দেয় চলচ্ছক্তিময়—
তাই আমি শেফালির, সৌজন্যের, অতিরিক্ততার···
তাই আমি শেফালির, আপাদমস্তক শেফালিরই
চাহি কোনোদিকে কিছু দেখিব না, ডুবিয়া মরিব।

৩৩

চূড়ান্ত সঙ্গম করে কুকুরেরা। সমসাময়িক
নগরে, বৃষ্টির দিনে, নরনারী পুত্রার্থে খেয়ায়
দোতলার লাল মেজে হাঁটুতে বিস্তৃত করে বল
অভ্যাসবশত মদ্যপান হয় রতিক্রিয়া-শেষে।
এ-বছর শীতকালে কলকাতায় মৌসুমী-শিল্পের
প্রদর্শনী হয়েছিলো, ডালিয়ার-চন্দ্রমল্লিকার
আখাম্বা গতর কেড়ে নিয়েছিলো আদি পুরস্কার
কুচ্‌কাওয়াজ-অন্তে গাইলো পুলিশেও রবীন্দ্রসঙ্গীত !
তবু ন্যূনতম কিছু কবিতাও লেখা হতে থাকে
'প্রতিপ্রাপকতা' নাম্নী শব্দ নিয়ে করে না তোলপাড়
এইসব লেখকেরা। এইসব লেখকেরা, হায়
খেস্তার নিকটে গিয়ে বলিল না, সম্ভ্রম উঠাও

দেখি হে তদ্‌বির-ভরা দেহখান—কিংবা কম্যুনিস্ট-
পার্টিতে যোগ দিলে পাবে পুরুষানুক্রম যজমানি !

৩৭

মহীনের ঘোড়াগুলি মহীনের ঘরে ফেরে নাই
উহারা জেব্রার পার্শ্বে চরিতেছে। বাইশ জেব্রায়,
ঘোড়াগুলি অন্ধকার উতরোল সমুদ্রে দুলিছে
কালের কাঁটার মতো, ওই ঘোড়াগুলি জেব্রাগুলি
অনন্ত জ্যোৎস্নার মাঝে বশবর্তী ভূতের মতন
চড়িয়া বেড়ায় ওরা—কথা কয়—কী কথা কে জানে ?
মানুষের কাছে আর ফিরিবে না এ তো মনে হয়
আরো বহু কথা মনে হয়, শুধু বলিতে পারি না।
বাইশটি জেব্রা কি তবে জেব্রা নয় ? ময়ূরপঙ্খীও
হতে পারে এই ভৌত সামুদ্রিক জ্যোৎস্নার ভিতরে ?
বামনের বিষণ্ণতা বহে নেয় ও কি নারিকেল
ও কি চলচ্ছবিগুলি লাফায়ে-লাফায়ে যাবে চলে ?
ও কী মহীনের ঘোড়া ? ও কি জেব্রা নয় আমাদের ?
অলৌকিকতার কাছে সবার আকৃতি ঝরে যায়॥

৪০

যেবার ওদের সঙ্গে যেতে হলো বেড়াতে পশ্চিমে—
মানুষ বেড়ায় ! তাই বহুদিন সাহাবাবুদের
কালো ছেলেটির কাছে ছিলে তুমি, মোটে ফর্সা নয়
আমার মতন, আহা প্রাতেরো, তোমারই কষ্ট হলো।
পশ্চিমের থেকে কিছু ঘাস আমি তোমাকে পাঠাই
খামের ভিতর, তুমি পোস্টাপিস থেকে চেয়ে নিও
খামটা খেয়ো না, ওতে আঠা আছে, কালিতেও বিষ—
পেটের অসুখ হলে কে তোমারে দেখবে প্রাতেরো ?
মনে আছে, কিছুদিন আমাদের বাড়ির উঠানে
তোমার চারিটি পায়ে জুতোমোজা পরিয়ে বলতাম :

প্রাতেরো, অঙ্কের ক্লাশে এইভাবে ফাঁকি দিতে হবে—
এইভাবে খেতে হবে কড়াইশুঁটির প্রস্রবণ।
মনে আছে, মনে আছে, মনে আছে প্রাতেরো আমাকে ?
—সাহাবাবুদের কালো ছেলেটি আমার চেয়ে কালো !

৪১

প্রাতেরো আমারে ভালোবাসিয়াছে, আমি বাসিয়াছি
আমাদের দিনগুলি রাত্রি নয়, রাত্রি নয় দিন
যথাযথভাবে সূর্য পূর্ব হতে পশ্চিমে গড়ান
তাঁর লাল বল হতে আল্‌তা ও পায়ের মতো ঝরে
আমাদের—প্রাতেরোর, আমার নিঃশব্দ ভালোবাসা।
প্রাতেরো তুমিও চলো সঙ্গে, আমি একাকী প্রস্রাব
ফিরিতে পারি না, কারা ভয় দেখায়, রহস্যও করে।
ছেলেবেলা থেকে কিছু ভীরু হতে পারা বেশ ভালো।

আমায় অনেক ভালোবেসেছিলো—ফুল দিয়েছিলো
টুপি কিনে দিয়েছিলো, পুরী থেকে মুরলি মাছের
লেজের শাসন এনে দিয়েছিলো—কতো উপহার !
আমি ছেলেমানুষের মতন ওদেরও ভুলিনি তো ?
প্রাতেরো আমার আর আমিও প্রাতেরো ছাড়া নই
—আমাদের দেবতা কি পা ঝুলিয়ে বসেন পশ্চিমে ?

৪৩

দুর্বলতা ছাড়া কোনো দোষ নাই। যখন ডালিম
সবুজ পাতার চাপে ফুলে ওঠে, লাল হয়—জলে
তখন আক্রোশভরে চাদর টানিয়া দিই খুব
মাথার ওপরে, তুমি ডেস্কভরা চিঠি লেখো যতো।
অরফ্যান্ ছেলের দল এবারেও ক্যাম্প পেতেছিলো
জানুয়ারি মাসে তারা রেখে গেলো শক্তিশালী ঘড়ি
অথচ উৎপল একা পুরীর মন্দির সারাবার

হাতচিঠি পেয়েছিলো—তবু হাত হতাশ হয়েছে !
তোমার পাগল তুমি বেঁধে রাখো, একদল যাবে
নারীদের সাথে করে অগোছালো গোধূলিবেলায়
ক্যারম খেলার ছলে মারাত্মক দুঃখ বিনিময়
ঘটে গেলো—চিরদিন কে আর ক্যারম খেলে বলো ?
অথচ অভ্যাস নয়, দুর্বলতা ছাড়া বোঝবার
হয়তো মাধ্যম আছে—তুমি জানো ডালিমেও জানে।

৪৯

এখনো যায়নি বেলা হাওয়া দেয় পশ্চিমা-তুফানী
এ-বন্দর ছেড়ে গেলে বন্দর পাবে না বহুদিন
গেলে কি জাহাজ ? ঘাট ছেড়ে গেলে এখনো তো জানি
আমারে জানাবে, যাই। বেলা হলো চপলতাহীন।
কোনোখানে বেলা যায়, কোনোখানে বেলা ফিরে আসে
ছায়ায় কপোলতলে ভাগ্য খেলা করে মুহুর্মুহু
কোমল বলের মতো শৈশব জড়িয়ে থাকে ঘাসে
বন্দরে, জাহাজঘাটে মানবিক বিদায় মিহিন !
বন্দরের মাঝখানে ঘনবদ্ধ কাঠামো-বেষ্টিত
দুর্দান্ত জাহাজে আছে কোনো এক—তোমার চেহারা
ওই জাহাজের মতো হয়ে গেছে। বহুদিন পরে
আ-পরিপ্রেক্ষিত প্রেম কেঁপে ওঠো, হও রোমাঞ্চিত।
বহুদিন পরে ব'লে মনে হয় তুমিই জাহাজ
বন্দরে, জাহাজঘাটে প্রেত হয়ে বিচরণ করো !

৬১

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা ঘাসের মতন
শিশিরে, চপেটাঘাতে, কিংবা ঝাউবন চূর্ণকরা
হাওয়ায় জাগিনি আগে ভোরবেলা, কখনো এমন
জাগিনি আমার চিত্ত চিরকাল ছিলো জয়করা
বিকালবেলার। আমি মাঝরাতে ঘুরেছি বাগানে।

এ কি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়—
জন্ম কি এমনই ভালো ? সন্ধ্যা হতে দেয় না লেখানে
অহংকার আলো করে রেখে দেয় মলিন আমায়।

কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা, না জাগিলে আর
কেমনে পেতাম ঘাসে শিশিরের নৈঃশব্দ্যে কণা
অবিরাম বুকে হেঁটে পার হওয়া—জীবনে পাহাড়
বাঘেরও অসাধ্য, আমি বাঘ হতে বড়ো জন্তু কিনা !
এ কি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায়
এ কি এ একাকী জন্ম ভোরবেলা উজ্জ্বল আমায়।

৬২

আমার বেদনায় বাংলা ভাষা যদি বিদ্ধ করে
নির্মলতা-হারা প্রাণ, তবে পূর্বে প্রণতি স্বীকার
ভালো নির্মলতা, ভালো শান্তি—জানি সুখের কদরে
আয়ু দীর্ঘতর হতো, হতো স্নিগ্ধ বারি দীর্ঘিকার।
আমার বেদনাময় বাংলাভাষা যদি বিদ্ধ করে
অজেয় অমর শ্বেতপাতার প্রচ্ছন্ন জাগরণ
তা কি নয় স্বর্গচ্যুত মন্দার সহসা বুকে ধ'রে
স্পর্শে প্রতারিত হওয়া ? তা কি নয় নিশ্চিন্তে মরণ ?

তবুও স্বর্গের মতো কিছু নেই, যা থেকে পতন
হবে অধোভূমে, কিংবা পাতালের প্রচণ্ড গহ্বরে
মর্ত্যের দণ্ডিত মর্ত্যে পড়ে থাকে অভ্যর্থনাহীন ;
আমার বেদনাময় বাংলাভাষা তাকে বিদ্ধ করে।
তোমাদের দরজা-জানালা ফুটোফাটা বন্ধ করে দাও
ফুলের বাগানে ভূত মারাত্মক প্রস্রাব ছিটোয়।

৬৩

ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো
যেদিকে দুচোখ যায়—যেতে তার খুশি লাগে খুব।
ভালোবাসা পেলে আমি কেন আর পায়সান্ন খাবো
যা খায় গরিবে, তাই খাবো বহুদিন যত্ন করে।
ভালোবাসা পেলে আমি গায়ের সমস্ত মুগ্ধকারী
আবরণ খুলে ফেলে দৌড় ঝাঁপ করবো কড়া রোদে
'উদ্ধুক' আমায় বলবে— প্রসন্নতাপিয়াসী ভিখারী—
চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয়, লাথি মারবো পোঁদে।

ভালোবাসা পেলে জানি সব হবে। না পেলে তোমায়
আমি কি বোবার মতো বসে থাকবো ? চীৎকার করবো না,
হৈ হৈ করবো না, শুধু বসে থাকবো, অন্ধ অভিমানে ?
ভালোবাসা না পেলে কি আমার এমনি দিন যাবে
চোরের মতন, কিংবা হাহাকারে সোচ্চার, বিমনা—
আমি কি ভীষণভাবে তাকে চাই ভালোবাসা জানে।

৬৫

এমন দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো। এমন দিনেই শুধু তুমি
প্রতিজ্ঞার চেয়ে বড়ো করাহত কপালেরে চুমি
আমারই নিমিত্ত ! যেন এতদিনে গভীরে নামার
পথ বলে দিলে, আমি নেমে গেলাম সংশয় না রেখে।
এমন দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো। মুখ ঢেকে আস্তিনে জামার
চলছিলাম সমস্তক্ষণ, বিষণ্নতা মানে না চিবুকে—
স্বাভাবিকতাই ভালো। মূর্তি মম সর্বস্ব আঁধারে
খেতে চায় এ-সামান্য ছায়ার সরিয়ে সুজ্‌নিখানি
[illegible]র রসাতলে, যেথা সাংঘাতিক শৈত্যে-হাহাকারে
[illegible]র, গন্ধ, রন্ধ্রে লোল পাপাত্মা সাবধানি।

এমন দিনেই শুধু বলা যায় তোমাকে আমার
বড়ো প্রয়োজন ছিলো— প্রয়োজন গভীরে নামার।

৬৮

এ কি আলিঙ্গন ? এ যে ওতোপ্রোত গ্রাসের গঠন
পদতল-মধ্য-মাথা তাল ক'রে ওষ্ঠ পেতে দেওয়া
খেতে ও খাওয়াতে। এ কি তামসিক কলঙ্কমোক্ষণ
নিষ্প্রভ প্রাণের, এ কি বদ্ধমূল স্ববিরোধী খেয়া ?
এবার চুরমার ক'রে দেবে দাও কান্তি-সভ্যতার
প্রয়োগনৈপুণ্য, ধর্ম ; অনুসারে শিল্পরীতি
বাক্ ও মুমুক্ষা—পরিপুষ্ট কোষে মূর্খ জ্ঞানভার
সমস্ত চুরমার ক'রে দিতে বক্ষে থাক কারো প্রীতি।

এ কি আলিঙ্গন ! এ কি সভ্যতার জড়ানো চণ্ডালে
আশিরগোড়ালিনখ ! এ কি আলিঙ্গন মানুষের
ঘোরতর, ব্যবধান গ্রাসচ্ছলনার অন্তরালে
অনৈসর্গিক কাম, এ কি জীবনের চেয়ে ঢের
কাঙ্ক্ষিত শিল্পের কাছে ? শিল্প কি বিমূঢ়
অনাসৃষ্টি আলিঙ্গন, সাংঘাতিক পুরুষে-পুরুষে ?

৭০

তোমারে আবহমান কাল থেকে চেয়েছি জানতে
আমি ভালোবাসি, আমি সব চেয়ে তোমারই অধীন—
রটেছে, শুনেছো কানে—প্রবঞ্চনা, চাতুরি ও হীন
নিশ্চিত শঠতা কতো। আদালতে বোবা ও কানাতে
সাক্ষ্য দেয়, কাজি শুধু এ-পাপের শাস্তি মরে খুঁজে,
পাপীর প্রতিভা চায় মুক্তি—আমি মুক্তি মানে বুঝি
তোমার বুকের 'পরে বসে-থাকা, গায়ে থাবা গুঁজি
তোমারে জাগাতে যেন কুমোরের মতন গম্বুজে।
জগতে সমস্ত সৃষ্টি ওতোপ্রোত মিথ্যা ও ব্যর্থতা

তুমি ছাড়া, দয়াময়ি ! যুক্ত করো কণ্ঠ ও গরাদে
ফাঁস-মফ্ চেনে, আমি স্বরাজের মর্মের বক্রতা
মানে বুঝি পরিত্যাগ, তোমারে শাসাতে আমি বাদে
এগিয়ে আসে না কেউ—এমনকি ভিক্ষুক সভয়ে
পার হয় খোলা-দরজা যাজ্ঞাহীন, বন্ধ করতল।

৭২

আজ সাধ্যাতীত ভালোবাসবো ব'লে সকাল আমার
এতো ভালো লাগে, এতো সুন্দর, আলস্যভরা বায়ু
ঘর না বাহির, নাকি উর্ণাময় স্বপ্নের ফোয়ারা—
আমি বসে আছি, আমি শুয়ে আছি চারিদিকে কার
পশ্চাতে পাঠানো শান্তি লেগে গেছে ভালোবাসবো ব'লে
আমি ভালোবাসবো, আমি হৈ হৈ করবো সারাদিন।
একবার মাঠের পাশে শুয়ে দেখছি প্রতিভা তোমার
ওদের খেলায় ব্যস্ত। দুঃখ হলে সংক্ষিপ্ত শহরে
কাকে বলবো, কথা দাও—দেড় হাজার চুম্বনের কম
এ-দুঃখ যাবার নয়, কাকে বলবো গান ধরো জোরে ?
অর্থাৎ স্বীকার করো, আনন্দে-আনন্দে সারাদিন
কাটতে পারতো, কাকে বলবো—নচেৎ হেমন্তে বেলা যেতো ?
প্রেমেও কি শান্তি পাই পরস্পর—শান্তি কোলাহলে
আজ সাধ্যাতীত ভালোবাসবো ব'লে সহসা সকালে।

৭৪

হাতে ধ'রে শিখায়েছো বালুকায় হাঁটিব কেমনে
দয়াময় ! শেফালির ফুলে ও পাতায় ভ'রে আছো—
কোমলতা দেখে দেখে চোখগুলি কঠোর হয়েছে
যা ধরা দেবে না তারে ধরিব না, দেখিতে-থাকিব
ফলের স্বকীয় রসে কেমন শৌখিন হয় বেলা
নগ্ন নারী-পুরুষের মতো হয়ে যায় অকাতর
দিতে কোনো শ্রদ্ধা নেই, নেবারও দীনতা যথাযথ—

হাত ধ'রে শিখায়েছো বালুকায় হাঁটিব কেমনে ?

হাঁটিতে শিখেছি সেই কবে থেকে, এখনো তোমার
হাতখানি ধরা চাই, বুঝে নেওয়া চাই—বুঝিব না
কিছুই ব্যতীত তুমি, এ কি অবলম্বনের ঘোর
এ কি পিতৃপরিচয় ? ছিলো মোর নিযুক্ত বাসনা—
একাকী বাসিব ভালো, একাকী মরিব, সে-ও ভালো
তুমি আসি বামনেরে উপযুক্ততায় তুলে ধরো।

৭৫

কমলালেবুর প্রতি যাওয়া ভালো। বহুদূর হতে
উহাদের ব্যবসায় শুরু হয়—ক্রমশ মেধায়
রক্তের চাপের ফলে তালকানা-হওয়া থেকে ওই
কমলাফলের হেতু ভেসে উঠি, জরোভাব কাটে ?
কমলা এগিয়ে আসে—ব্যবধান ঘুচে যেতে থাকে,
প্রধান, অরুচি, তৃষ্ণা অনুভব করেছে কমলা
মানুষের, যেন তার রূপ কোনোমতে নক্ষত্রের
শোভার আধেকশায়ী, আধেক শিল্পের আস্বাদন।
একভাবে কমলার হেতু হতে চেয়েছে কবির
জিহ্বা ও ব্যক্তিত্ব। তবু ব্যক্তি হতে জিহ্বা বড়ো নয়—
ফানুশ, ফুলের চেয়ে মহত্তর সৌরভ নগরে !
ঢিঢি পড়ে যায়, গাল-গল্পে ফোটে কবির শূন্যতা
যাহাদের স্মৃতি আছে, যাহারা লৌকিক ধ্যানী নয়
তাহাদের প্রতি চেয়ে কমলারা ব্যবসা বেঁধেছে !

৭৭

একটি রুমাল আমি পাই নাই কোনোদিনই খুঁজে
মহিলা-যাত্রীদের কামরায় খুঁজিতে উঠেছি
কখনো গিয়াছি ট্রামে কলুটোলা নার্স-কোয়ার্টারে
খুঁজেছি অনেক আমি মানসের বোনের সহিত।

ছাত্রী-নিবাসের কাছে প্রতিদিনই ঘুরিতে গিয়াছি
এমনই মারাত্মক রুমালের স্বার্থে, বিপর্যয়ে
কখনো পড়েছি আমি, কাটিয়ে উঠেছি ফের, তবু
গিয়েছি দোকান হতে দোকানির নিভৃতির কোণে।
বহুদিন বাদে কালই খবর পেয়েছি মধ্যরাতে
ও-প্রান্তে রুমাল শুরু করিয়াছে খুঁজিতে আমায়
পথে নামিয়াছে কিংবা উঠিয়াছে খবর পাই নাই
হায়, ওর খোঁজা হবে মানুষের সাহায্য ব্যতীত।
আমি পুরস্কার ঘুড়ি ফানুশ কতই উড়ায়েছি—
রুমালের কাছাকাছি ঘুরিয়াছি আমিও অনেক।

৯৫

শব্দ গুলিস্নুতো, তাকে সীমাবদ্ধ আকাশে ভাসাতে
আমার পেট্‌কাটি চাই, কিংবা কাঁথা, মায়াভরা পাড়
সংসারে গেরস্ত-মেজে জুড়ে থাকবে মাটির উপরে—
এরই নাম ভালোবাসা, এরই নাম চড়ুই মুখর
কাঁচা কিছু মানুষের বেঁচে থাকা—ইটে, খোড়োঘরে :
সামর্থ্য বাসনা মিশে এ এক মায়াবী ছেলেখেলা !
তোমরা, যারা বড়ো, তারা শ্রুতি বন্ধ ক'রে থাকো দূরে
আমি ভালোবাসবো, জানি গাছে ফুল ফোটানো দুষ্কর
খর জল মূল খায়, জানি শাদা পিঁপড়ের ফুরফুরে
শত্রুতা ; অবশ্য জানি, শব্দ কতো আদর্শ নির্ভর—
শব্দ কোলজোড়া ছেলে হাসে-কাঁদে, হিসি:করে বুকে
খুচরো করে দেয় টাকা এবং যা সোনালি সম্বিৎ
তাকে করে তামা, গায়ে জামা নেই, মুহু নতমুখ—
এ ভাবে শব্দকে জানি, একদিন তারও মৃত্যু হবে।

৯৬

ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে
জলের সাঁতারে তেল কিংবা বলা ভালো সে গন্ধের

ভিতরের তীব্র, তাই ব'য়ে গেছে হাওয়ার উদ্দেশে
ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে।
তাকে তো চিনতো না কেউ, আমরাও অস্পষ্টভাবে জানি
তবু তারই জন্য সব অগোছালো গুচ্ছে সাবধানি
মায়ার অঞ্জনকাঠি, কাঁথা ও কল্পনা ক্রমে মেশে—
ঠিক কী কারণে গেলো বোঝা ভার, কিন্তু গিয়েছে সে।
একমুঠি স্পষ্ট মাংস, ঠাণ্ডা-হিম যেমন প্রকৃতি
পাংশু ও নিষ্কেতন, তেমনি সে, মৃত্যুর লাঞ্ছিত
সদাগর কিংবা যেন আমারই মুখের অনুকৃতি!
ভুলে যাবো, ভাড়াটে যেমন ভোলে পরাশ্রয়, পেলে
অবশ্য নতুন, শুধু মাঝে মাঝে অযুক্তি-কল্লোলে
ভেসে উঠবে মাংস, মুখ নিদ্রাতুর, বিষণ্ণ, করুণ॥

কীসের জন্যে

সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে—বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না! মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে
কারণ, নাকি উড়োজাহাজ? কারণ, নাকি হলুদবাড়ি?
বলতে এলে বেঁধে ঠেঙাবো, কারণ আমার ছ্যাকরাগাড়ি
উল্টোপথেই চলবে শুধু, আমি তোমার দেশেও স্বাধীন!
ঘার করতল নেই সে কাকে ভিক্ষে দেবে?
ঘার করতল নেই সে বুকে হাত বুলোবে?
উলুকঝুলুক করবে এবং বলবে—অসীম
ভালোবাসার রোদন আমার হে কস্তুরী—

এই সমস্ত তুমিই পারো সহ্য করতে, তোর লালসা

সবার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে—মন চেতনা কেড়ে নিচ্ছে
বলছে, বেঁধে ফেলাই হলো, শুভবিবাহ।

অনেক কথা বলবো বলে উঠেছিলাম মঞ্চে যখন
মিটিং হঠাৎ ভেঙে যাচ্ছে—লম্বা ঘড়ি
গা ঘষছে গোল ঘড়ির সঙ্গে—দুই নাবালক
বলছে, ভারি যন্ত্রণা পাই—
যন্ত্রণা কি চালের কাঁকর? ফুটবলে ফাঁক? হাঁটুর ব্যথা?
যন্ত্রণা কি ভালোমানুষ সবার হাতেই তালি বাজাবে?
মিষ্টি খোকন, তোদের লেখা পড়তে পারি
এমন লেখা লেখ্ না যেমন লম্বালম্বি দীঘির ধারে পথের রেখা!

সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
আঁচড়ে-কামড়ে নিজেই মরি
গা-ভর্তি ঘা, রক্ত পড়ে, জিউলি গাছের আঠার মতন
রক্ত আমার রক্ত পড়ে—বড়ো ধরনের যন্ত্রণা পাই
কিসের জন্যে নিজে জানি না।

একটি পরমাদ

বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি—ওই একটি পরমাদ ছিলো।
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
আন্ধারে-রোদ্দুরে ভেসে
হাসির ছটা ভুলিয়ে গেলো—ভিতরে কেউ কাঁদছিলো।
বহুকালের সাধ ছিলো, তাই কইতে কথা বাধছিলো।

ও মন দরদ দিয়েছো তায়
রাত-ভেজানো বনের লতায়

একদিবসের প্রেমে প্রখর স্বরবিরহ বাদ ছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি, ওই একটি পরমাদ ছিলো।
ডাকাত ভালোমানুষ সেজে
আড়ালে হাত কামড়ে নিজের
রক্তচোষা এক ছাপোষার হৃদয়হরণ সাধ ছিলো।

বাঘ

মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে···
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না।

আমার ভয় হলো তাই দারুণ কারণ চোখ দুটো কৌতুকে
উড়তে-পুড়তে আলোয়-কালোয় ভাসছিলো নীল-সুখে
বাঘের গতর ভারি, মুখটি হাঁড়ি, অভিমানের পাহাড়···
আমার ছোট্ট হাতের আঁচড় খেয়ে খোলে রূপের বাহার।

মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে···
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না॥

আমি ভাঙায় গড়া মানুষ

মায়াবী এই আলোয় ওড়ায় মায়া ভাঙার ফানুস
যে জন ছিল গোড়ায়, তাকে পুড়িয়ে মারে মানুষ
আর যারা সব পথিক, শুধু তার পিছনে চলে

মানুষ গিয়ে ছোঁ মারে সেই এক মুঠি সম্বলে—
স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতায়, তার মানে, ঐকিকে
জড়িয়ে করা বহু ; যেমন করেছেন বাল্মীকি !

মানুষ কাকে বাঁচায় ?
যদি এমনি ক'রে খাঁচায়
পোরে পাখির চেয়েও খালি
নিবিড়, নরম গেরস্থালি ?
আমার ভয় করে, ভয় করে
কেবল ভয় করে, ভয় করে
যদি নিজেই তাকে মারি…
এবং এটুকু তো পারিই, আমি ভাঙায় গড়া মানুষ।

ভুল থেকে গেছে

নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে…
প্রধান অসুখ নিয়ে কলকাতায় ঘোরে লক্ষ লোক
আজ কিছুদিন হলো তারই মধ্যে বসন্ত এসেছে
প্রত্যক্ষ পলাশে, পাশে মুচকুন্দ চাঁপার নোলক—
নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে
ব্যবহারে।

মানুষের সব গিয়ে এখন রয়েছে হিংসা বুকে
প্রেম-পরিণয় গিয়ে এখন সে রক্তে অসুখে
মোহমান, প্রাণ নিতে পারে
নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে
ব্যবহারে।

মানুষের সঙ্গে আর মেলামেশা সঙ্গত নয়—
মনে হয়, এর চেয়ে কুকুরের প্রেমাও মধুর।

কে যায় এবং কে কে

গাছগুলো আর পাখর এবং পাখরভরা কামিন
বনের মধ্যে আমি তখন বনের মধ্যে আমি
মনের মধ্যে কে যে
মনের মধ্যে বিবাদ করে স্বপ্ন দেখায় যে যে
বনের ভিতর কে যায়
মনের ভিতর বৃষ্টি আমার বর্বাতিটা ভেজায়
কে যায় এবং কে কে
এক ভাঙা ইঁট থাকলো পড়ে—হায় রে, আমার থেকে।

এখানে সেই অস্থিরতা

অস্থিরতার সূত্রে কোথায় ?
খুঁজতে-খুঁজতে বনস্থলীর সব ক'টি ঘাট পেরিয়ে এলাম—
সামনে নদী
পাখর পেতে পরীরা পা ঘষেন একলা
ইঁট মেরে ডুম্ ভাঙতে যেমন, মেঘ ছুটে যায় জ্যোৎস্না-বদি
তখন দ্রুত পাখরচ্যুত—অস্থিরতার সূত্রে কোথায় ?…
এমন কথা বলতে-বলতে কোন্ পথে যান ক্ষুব্ধ পরী ;

শান্তিতে তাঁর স্নান হলো না !

আবার আমি একলা হলাম
বনস্থলীর মুখ দেখা যায়—আয়না-নদী ছাড়িয়ে গেলাম

এবং নদীর সূত্র কোথায় ? বলতে-বলতে, পাহাড়তলি···
একটা গল্প তোমায় বলি :
চোখ বুজে কান রাখলে খোলা
নদীর সূত্রপাতের গন্ধ, আঁতুড়ঘরের সামনে দোলা
আর ঝাঁকেঝাঁক্ টিয়া।
আমার ও মন দরদিয়া···চোখের
জল গড়ালো পাথর, বুকের অস্থিরতার পাথর !

আবার আমি একলা হলাম
বনস্থলীর পরে নদীর পরে পাহাড় ছাড়িয়ে এলাম
শহরে, আজ শহর দেখবো
গলির ঘরে শুয়ে আকাশ
যদি দেখায় দু'খানি প।
শান্তিতে তাঁর স্নান হলো না···
এখানে সেই অস্থিরতা, নবজাতক, বারুদগন্ধ ?

কবিতার সত্যে

কবিতার সত্যে আমি একঝলক মিথ্যের বাতাস
লাগাই, কী পালটে যায় কবিতার সত্য একদিনে
তাহলে সত্যের নেই সেই বুঝ, সেই দাঁড়সাঁতার,
সত্য নয় শিশু, নয় রাজনীতি, নয় যুথা ঘাস !

সত্যই নিষ্ঠুর—এই শুনে আসছি নিরবধিকাল
যেন সত্য আমাদের পূর্বপুরুষের পাটরানী,
শতাব্দীর একতীরে বসে শোনে, অন্যতীরে তাল
পড়ে ভাদ্রমাসে, হায় প্রকৃতি-প্রাক্তন রাজধানী !

সত্যকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাই গঙ্গার বাতাসে

গা জুড়োতে, তারপর কষে মার দু'গালে থাপ্পড়
পোঁদের কাপড় তুলে ছেঁকা দিই দু'পাটা মাংসের
উপরে কলকের দাগ ; তৎক্ষণাৎ মিথ্যে হয়ে আসে—
বিপুল, অমিততেজা, জাহাবাজ সত্যের ভ্রূকুটি···

আমি উঠি, কবিতার হাত থেকে মুক্ত হই, উঠি, উঠে পড়ি ॥

সে—তার প্রতিচ্ছবি

একটি চূড়া, স্থির যেন সে একটি চূড়ার মতো
সাদৃশ্য তার খুঁজলে আছে, হয়তো উঁচু গাছের কাছে
নয় পাহাড়ের সঙ্গে তুল্য খানিক অনুন্নত
একটি চূড়া, স্থির যেন সে একটি চূড়ার মতো।

একটি নদী, স্থির যেন সে একটি নদীর মতো
কেউ বা ছিলো কপোতাক্ষ, কেউ হয়েছে ক্ষীণ গবাক্ষ
কেউ বা ধুলা কে চুলখোলা—লুকোনো, স্পষ্টত
একটি নদী, স্থির যেন সে একটি নদীর মতো।

একটি শিকড়, স্থির যেন সে সেই শিকড়ের মতো
যে চায়, কাড়ে, শিকড় বাড়ে—হাতের ছোঁয়া চোখের আড়ে
পাতালে যায়, পাতালে যায়···দুরন্ত, সংহত
একটি শিকড়, স্থির যেন সে সে-ই শিকড়ের মতো ॥

দুই শূন্যে

দুদিকে যায়, দুদিকে যায়—একদিকে কেউ যায় না
দুটি জীবন চাখতে গেলেও একটিকে হারায় না
এমন মানুষ পাওয়া শক্ত, চতুর্দিকের বেড়ায়
বন্দী করে রাখছে এবং যে নেই তাকে এড়ায়

সমস্তদিন সমস্তরাত এই খেলাটির কাছে।
আমার হৃদয় ভাগ ক'রে দুই শূন্যে বসে আছে।

কেউ নেই

কে আছো ওখানে, কে হে
হয়তো আমার চেয়ে ছোটো—
গাছের ফুলগুলি ফুটে ওঠো।

মৃত্যু ও মানুষে কিছু পেয়ে
কে আছো ওখানে ? তুমি কে হে ?
হয়তো আমার চেয়ে ছোটো—
গাছের ফুলগুলি ফুটে ওঠো।

কেউ নেই। কে আমাকে নেবে ?
ও ফুল, তোমার মতো দেবে।
কেউ নেই। কে আমাকে নেবে ?

দুঃখ যদি

দুঃখ যদি ভুল করে তাকে আমি জঙ্গলে বেড়াতে
গিয়ে ফেলে আসবো দীর্ঘ গাছেদের কাছে
যে-গাছে কাঁটাও নেই, ফুল নেই, অভ্যর্থনা নেই।
ছোটোদের কাছে নয়, নিজ দুঃখে ছোটোরা দুঃখিত
আমিও তো ছোটোখাটো মানুষ, আমার সঙ্গে থেকে
এতোদিন সোজা দুঃখ হঠাৎ কেন যে গেলো বেঁকে !

অন্ধ আমি অন্তরে-বাহিরে

পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার নিঃশ্বাস ঠেলে
ক্রমাগত অন্ধকার পড়ে
দূরে-কাছে জনপদ, সিংহাসন জেগে ওঠে
মানুষের হৃদয়ের কাছে

দুই সিংহাসন নিয়ে মানুষের এই খেলা, মানুষের এই বর্ধমান
শোক আর সাধ আর সিঁড়ি ও নরম জলরেখা···
স্পষ্টত সবাই চেনে, সকলের চিন্তা ও কাজের
ভিতরে মসৃণ হয়, মসৃণ করার চেষ্টা হয়, হতে থাকে।

আমি প্রাণপণ এক শিরোনাম নিয়ে নির্যাতন
পেতে থাকি রক্তে ঐ আধভাঙা রবীন্দ্রনাথের
উচ্চারণ : অন্ধ আমি [হায় অন্ধ] অন্তরে-বাহিরে !

মানুষ অনেকে অন্ধ, অনেকের অন্ধতা গিয়েছে।
বুঝেছি যাবার নয় আমার চোখের ভিক্ষা, চাপ···
যদি কৃপা করো, যাই, সন্তানের মুখ দেখে আসি !

একদিন

মানুষের ভালোবাসা মানুষেরই কাছে দামি
একদিন সুস্পষ্ট গন্ধ ছিলো তার সন্ন্যাসী গুহায়
অর্থাৎ হৃদয়ে ঘ্রাণ, মনঃপ্রাণ ভক্তের প্রণামী
নিতেও উৎসুক ছিলো, চারিদিক আত্মহত্যাকামী
আজ, কেন ? কী কারণে ? জেনেও নিশ্চিন্ত সুবিধায়
মানুষ লুকিয়ে থাকে ঘাস হয়ে মনের গভীরে··· '
সাড়াহীন, শ্রুতিবদ্ধ, প্রজড় জীবিতমাত্র প্রাণে
মানুষই ছুটেছে দেখি মৃত্যুর নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানে
সারবদ্ধ পোকা যেন বাদলের, তাড়িত বিষের
কিংবা তারো চেয়ে নীল, শোণপাংশু, মালিন্যের হারে—
মানুষ ? মানুষই তাকে বলা যায়, অন্য কিছু নয়
উৎকৃষ্ট বিশ্বাস নিয়ে জন্মে যদি শিশুর হৃদয়
এখনো আমার দেশে, তার কানে-কানে বলি আমি :
মানুষের ভালোবাসা মানুষেরই কাছে ছিলো দামি
একদিন ॥

সব হবে

ভালোবাসা সবই খায়—এঁটোপাতা, হেমন্তের খড়
রুগ্ন বাগানের কোণে পড়ে-থাকা লতার শিকড়
সবই খায়, খায় না আমাকে
এবং হাঁ করে রোজ আমারই সম্মুখে বসে থাকে।

আমি একটু-একটু তাকে অবসন্ন হাওয়া দিতে পারি
একটু এনে দিতে পারি আমরুলের পাতার প্রকৃতি
স্মৃতির কাঁথায় তাঁর স্পর্শ—যিনি উপস্থিত নেই
এইসব—দিতে পারি, এতে কি ও শ্রীমুখ ফেরাবে ?

আমার ভিতরে কোনো গোলোযোগ নেই, প্রেম নেই
অন্যমনস্কতা লেগে আমার ভিতরে হয়ে নেই
কিছু বা পাথর, নেই ফুটোফাটা, ফেলে-রাখা ধুলো
আমার ভিতরে আছে সর্বাঙ্গ রঙিন পথগুলো—
এতেই সবই হবে ॥

আসতে পারে

খুব সহজেই আসতে পারে কাছে
ওই, যা কিছু—বুকের ভিতর আলগা হয়ে আছে।
পাতার ফাঁকে উঠছে শামুক, শিকড় কাটে উই
আমার মতন একলা মানুষ দুখান্ হয়ে শুই।
চোখের পাতা বন্ধ,—কেবল একটি-দুটি নাচে
খুব সহজেই আসতে পারে কাছে।

চাঁদের দেশে

ওই যে দূরে দেখছো বাড়ি—ওখানে পৌঁছাতে
অনেকগুলো রাস্তা ছিলো চলন্তিকার হাতে
একটি ঘুরে, একটি দূরে, একটি চোখের সোজা—
গোপন যিনি ছিলেন, তাঁকে বয়সকালে বোঝায়।

কেউ বা যেতো মাঠ পেরিয়ে, কেউ বা যেতো উড়ে
রামধনুকের রঙিন খেলা ছিলো আকাশ জুড়ে
এখন যেতে সর্বে ক্ষেতে উল্টে পড়ে মেঘ—
হুটরাপেটা চাঁদের দেশে থামে হাওয়ার বেগ।

বিরহ তার পাত্র থেকে আগুন ঢালছে

নেই এখানে দেখতে পাচ্ছি, কোথায় গিয়ে রাখছে ঢেকে
নষ্ট শুভ্র মুখচ্ছিরি, জড়িয়ে তাকে থাকছে কে কে ?
উরুৎ, বাহু, পদ্মনাভি এবং নকল স্তম্ভ খিলান
জঙ্ঘা, মোচড়—গর্তগুহার পার্শ্ববর্তী দীর্ঘ টিলার
মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে—সমগ্রকে করছে গুঁড়ো
সাধের নারী নষ্ট করে পুরুষ, যেন পাহাড়চুড়ো।

এই এখানে, থাকতো যখন, এক বাগানে থাকতো একা—
সঙ্গে ছিলো পুষ্প বকুল, কৃষ্ণচূড়া আমার দেখা।
আর ছিলো যুঁই কনকচাঁপা, পোড়া কপাল থলকমলা,
সমগ্রে তার চক্ষু প'ড়ে থমকে যেতো আমার চলা।

আসল অর্থে—ছড়িয়ে দিলাম, তাকালে চোখ নামতো নিচে,
বিরহ তার পাত্র থেকে আগুন ঢালছে আজ পিরিচে।

ছট্‌ফটিয়ে উঠলো জলে

ছট্‌ফটিয়ে উঠলো জলে, হারিয়ে গেলো কেউ
চিহ্ন পড়ে রইলো ঘাটে—অন্যরকম ঢেউ
ছড়িয়ে যেতে চাইলো দূরে, অনেক দূরে দূরে
হাওয়ার মতো সহজ ঘুরে ঘুরে
ছড়িয়ে যেতে চাইলো কিছু অনেক দূরে দূরে।
কী সেই কিছু ? সেও কি কোনো জন ?
আমার মতো নিভন্ত, নির্জন—
ছড়িয়ে যেতে চাইলো কাছে—কিংবা দূরে দূরে।

এখানে কবিতা পেলে গাছে-গাছে কবিতা টাঙাবো

একটি সভায় আমি গেছি বসে কাঠের চেয়ারে—
সম্ভবত টিন, যার রং লাগে প্রত্যেকের পিছে
তাই দেখে পথচারী গোয়েন্দার চোখের মতন
মেয়েদের চোখ হয়, মেয়েরা কী যেন ভাবে তাকে···

এ বাবা গেরস্ত নয়, আলাভোলা, কবির আত্মীয়
হয়তো নিজেই লেখে, না তো ছাপে অন্যের প্রতিভা!
কিছু একটা করে ওই কবিত্বের সঙ্গে মিলেমিশে
হাত মারে, হেগে যায়—রঙিন পিচকারি কিনে ভরে
ভাষার সাবান জল তারপর ছড়ায় ছিটোয়
বিভিন্ন কাগজে···
এভাবেই, যেন গাছ, ছাদ ফুঁড়ে আকাশের দিকে
বেড়ে চলে, জীবন্ত বলেই বাড়ে, প্রাসাদ বাড়ে না
বোদ্ধার ইটের দাঁতে ছায়া মেলে, বরং ঝিমায়
ঘরবাড়ি, ফলমূল, স্বপ্নরাজ্য, কুকুরের বিচি।

তেমনি সভায় আমি বসে আছি টিনের চেয়ারে
পাশেরটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম খানিক
কাউকে বসাবো যার মুখে টক পচা গন্ধ নেই
পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক, কবি নয়, নোংরা শ্রোতা নয়।
গন্ধে গোলাকার নয়, অধিকন্তু, দুই কানে শোনে!
এখানে শোনে না কেউ, কথা বলে, বর্ণনার কথা
ভিতরের কথা নয়, কানে-কানে কথা নয় কোনো।

সেই সভাটিতে গিয়ে, শুয়ে বসে, মলত্যাগ করে
আমি খুবই বিষণ্ণতা বোধ নিয়ে বর্তমানে আছি
একাকী, বান্ধবহীন। ওরা স্থির সুস্থির যেহেতু

কবি ব'লে দুঃখ পায়, শরীর তছরূপ করে পায়
আনন্দ, আনন্দ! হায়, আনন্দ কোথায়, কে তা জানে?

বাস্তবিক যেন হাওয়া, দুরন্ত অবাধ ঝঞ্ঝা আমি
ছুটেছি যেখানে হেঁটে যাওয়া ছিলো প্রকৃত সঙ্গত
গাছের ভিতর দিয়ে একদিনই পরিত্রাণ নেবো
মানুষের শহরের হাত থেকে ছুটি নেবো ঠিকই
যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাবো, ভ্রূক্ষেপ করবো না
এলোমেলো করে যাবো গ্রাম, বন, মানুষ, বসতি
সমস্ত, সমস্ত। কিন্তু, এভাবে কি কিছু পাওয়া যাবে?

কিছু, মানে কোন্ কিছু কার কিছু? কার জন্যে কিছু?
উত্তর জানি না বলে সেই কোন্ প্রত্যূষে উঠেছি
উঠে থেকে হেঁটে চলা—কোনোদিকে, হাঁটার অসুখে
শুধু যাওয়া শুধু যাওয়া—যেতে যেতে পিছু ফেরা নয়
পিছনে সভায় দীর্ঘ কাব্যপাঠ, কাব্য-আক্রমণ
আমায় হাঁ করে খাবে শহরের উদ্ভিদ-গলিতে।

আমাকে চেনে না কেউ এদেশের হুড়ি ও পাথর
যেখানে এসেছি আমি বুঝে নিতে এবং বোঝাতে
মহিষের পিঠে চড়ে চলে যেতে উদাসীন সুখে···
আমার পিঠেও তাকে কোনো কোনো দিন তুলে নেবো—
এই পরস্পর, এই সর্বশক্তিমান দেওয়া থোওয়া
কখনো বুঝিনি আগে, কখনো চড়িনি বলে মোষ!
এখানে কবিতা পেলে গাছে গাছে কবিতা টাঙাবো।

এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার বসন্তের দিনে !

দূরের পাহাড়তলি কিংবা তুমি দিনান্তের রেখা
নীল জল অথবা হাউই
তুমি তীরন্দাজ কবে খরগোশ ধরেছো
অতসী কুসুমশ্যাম হৃদয় তোমার
স্বদেশে বিদেশে মিশে শ্রাবণ কি তুমি ?
ভালোবাসা দিলে তবে ভালোবাসা পাবে
তোমার যোগ্যতা গূঢ়
নিশ্ছিদ্র অতীত নিয়ে তুমি করো খেলা
তোমার লাটাই ভালো
চাঁদ বেনে উড়ে যায় কোঙ্কন সিংহল
ব্লিজার্ড ! ব্লিজার্ড !

পুবদিকে দেখা যায় চার্চ, সলোমন
তোমরা যেখানে করো বসবাস সেখানে অন্তত
বিস্তর নাপিত আসে—
এই ঘনিষ্ঠতা, এই এজেন্সি মারফৎ
তোমাদের কাটাছেঁড়া, ধর্মযুদ্ধ—নীল ও লোহিত
পোপের জন্ম ও মৃত্যু
'উনি কি ফ্যাসিস্ট ?'
এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার
বসন্তের দিনে
বসন্তের দিনে করে বসবাস নেপথ্য ও স্টেজ
হিন্দু ও অহিন্দু করে কোলাকুলি, হত্যা, মুষ্ট্যাঘাত !

চেতনার মতো এই অচেতনা শিখিয়েছো তুমি
তুমি ধর্মমত তুমি যৌন তুমি কামিনীকাঞ্চন
তুমি কোষাগার তুমি উচ্চাকাঙ্ক্ষা তুমি ধানজমি
তোমার দুষ্কৃতি তুমি ব্রাহ্মণের, চণ্ডালের নও।

. অন্তরের ঘাম থেকে মুক্তি নেই—মুক্তি নেই কোনো
আবিল পাঁকের থেকে মুক্তি নেই বিদগ্ধ হ্রদের
মাছরাঙাদের মতো ওড়ে পেটিকোট
তুমি সন্তর্পণ, তুমি শ্মশানের মাঝে বাড়ি করো
হৃদয়ে দিনের মতো চঞ্চল তোমার আনাগোনা
দুপুরের থরো-থরো শটিক্ষেত, আখরোট বাদাম
তুমি সব পেতে পারো ধর্মাধর্ম—তুচ্ছ ক'রে প্রেম !

এই পথে দেবদারু—বাদুড়, বনের ভাঁট ফুল ।
দেয়ালে দেয়ালে জমা ম্যাজেণ্টা ক্রিমজন
মজাদিঘি ভাঙাগ্রাম, দোলমঞ্চ—ব্যর্থ স্থপতির
নশ্বর হাতের কাজ,
ভালোবাসা ?
জোনাকির আলো—
এ কি সব ?

চাঁদের অপরিসীম ক্লান্তি, তাই দূরে আধোলীন
নিকটে আসে না যেন ভুল হবে
চরিতার্থতার শেষে আছে কি বিস্ময়ে-ঘেরা দেশ
মুক্তির সংশ্রবহারা এ দিনযাপন ?
কিংবা মুক্তির মৃত্যু ও শৈশবে ।

রাজার বাড়িতে আজ ভোজসভা
তীর্থে প্রিয়নাম
তুমি না আড়াল থেকে জনতার, চাক্ষুষ রাজার !
তুমি কোন্ পথে যাবে ?
কার সংবৎসরের ধৈর্য নেবে ? কোন্ অন্নকূট ?
তুমি ধর্ম-পুরোহিত
নিষ্ক্রিয়তা তোমার নিয়তি

একত্রে করেছো তুমি বর্তমান অতিবর্তমান
ছায়া-ছলনাকে করো সমাসীন
তুমি সব পারো
তোমার যোগ্যতা আর স্বাধীনতা অনির্বচনীয়।

ধীরে ধীরে দ্বার খোলে গূঢ়তার, রহস্যবোধের
শুকতারা তুলে ধরে অন্ধকার কুঁড়ির চিবুক
—পছন্দ না হয়ে যায়!
আরো পরিস্ফুটতর হবে

পৃথিবীর অতীতের পারা তাকে স্বচ্ছ করে তোলে
মুহূর্তেও ধরা পড়ে প্রতিমুহূর্তের ভূ-কম্পন
মানুষের ধর্ম থেকে মানুষের এই ফিরে যাওয়া
স্তব্ধ হয় চির অকস্মাৎ
দ্বার খোলে গূঢ়তার, দ্বার খোলে রহস্যবোধের
শুকতারা তুলে ধরে অন্ধকার কুঁড়ির চিবুক
—পছন্দ না হয়ে যায়!
আরো পরিস্ফুটতর হবে।

আজ সকলই কিংবদন্তী

আজ সকলই কিংবদন্তী, পাতালে বাস করলে শুঁড়ো
সন্ধ্যেবেলায় পা ছড়িয়ে বসতে নাকি পাহাড়চূড়োয়?
নিত্যি নতুন পোক্ত তাড়ি
সর্বনাশের স্বপ্নে-মেশা আঁধার-করা বিষের হাঁড়ির—
শক্তি, খেতে একচুমুকে, মন্দ নয় সে-কাণ্ডখানা!
জগজ্জীবন চমকে দিয়ে ভাসতো সুবাস হাস্নুহানার—
আজ সকলই কিংবদন্তী!

রগচটা কোন্ পদ্যে জবর
থাকতো লেগে জাদুর ছিটে, সন্ন্যাসিনীর গোপন খবর
গোমাংসবৎ পরিত্যাজ্য—
আজ জিতেছো নকল রাজ্য সৌদামিনীর…
হয়তো ভালো
এই জীবনের সবটুকু নয় তীব্র আলোয়
জ্বলতে থাকা
পথ বলে সব ন্যাংটো তো নয়? পুচ্ছে ঢাকা।
কিন্তু যারা বহির্মুখী
বিষণ্ণ ধান ভাঙছে নোড়ায় জনমদুখী
শব্দে রঙে সাত শ ঝাউয়ের কান্নাতে ছাই
ছড়িয়ে দিয়ে বলছে, তাকে এমনি সাজাই
মতান্তরে, অঘোরপন্থী
আজ সকলই কিংবদন্তী।

কবির মৃত্যু

[কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য স্মরণে]

মৃত মুখ, তাকে আমি কুয়োর জলের মতো স্তব্ধ মনে করি
পাতালের তাপ যদি কিছু থাকে, তাকেও স্থিরতা
কঠিন আঙুল তুলে ঘুম পাড়ায়
ধ্যানমগ্ন করে…
আমি ভয় পাই, আমি মুখ ঢাকি, বাস্তবে তবুও
কবির গণনা বলে, ও-মুখ-পাষাণই প্রিয়তম
রূঢ় সুষমার পঙ্‌ক্তি, ওই শব্দ স্মৃতির জননী…
কিন্তু সে-কবিও যান হাতে গড়া শস্যক্ষেত্র ছেড়ে
একদিন
পাকা ও প্রসন্ন ফল ঝরে পড়ে তপোক্লিষ্ট ভুঁয়ে
শীতের বাদাম করে ওড়াউড়ি, ময়দানের ঘাস

গভীর আগুনে যায় উড়ে-পুড়ে···
দেখে মনে হয়
কলকাতা কবির মৃত্যু সমর্থন করে ॥

এক হতচ্ছাড়া যুদ্ধ চাই

কথা বলতে বলতে এক নদীর ধারে পৌঁছলুম
সেখান থেকে বিনি-মাগ্‌নার খেয়া
এপারের হাতছানি ওপার থেকে আমায় টেনে এনেছে।

কথায় কথায় জন্মমৃত্যুর উড়ো হাওয়াটা পাক্ খেয়ে গেলো
মধ্যিখানে রাতুবাম্‌নির চর
তার ভেতরে পানকৌড়ির বৃষ্টি মাথায় খোলাছাতা
এবার তাহলে আসল ব্যবসার কথাটাই তুলি ?

কনেতে মন লাগলে দেনা-পাওনায় আটকাবার জো নেই
নিন্দুকেও জানে, দুপারের লোক কিসের জন্যে কোমর বেঁধে বসে আছে
মোটকথা, এক হতচ্ছাড়া যুদ্ধ চাই, নদীর বুক-শুকোনো যুদ্ধ
যাতে ক'রে এ-জমির কান ও-জমির প্রাণে গিয়ে বাঁধা পড়ে।

আমি সহ্য করি

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমায় ক্ষুধা আর প্রাণপণ গাছের শিকড়
যেন আমি মাটি, যেন কলকাতার প্রধান সহ্যের রাস্তা, যেন আমি
দেড়বস্তা রাক্ষুসে বাচ্চার জন্যে দুধহীন মাই খুলে রেখে বসে থাকি
আর দাঁত চিবোয় চামচিকে মাংস তার···খেলা করে, তাছাড়া মৃত্যুর সঙ্গে
আর কোন্ কূট কাজ ওর ? ঐ ছেলেদের ?

আমি সহ্য করি…

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমায় ক্ষুধা আর প্রাণপণ গাছের শিকড়
যেন আমি মাটি, যেন পড়ো ঘর, পুকুরের পাঁক
যেন আমি সমস্ত নিষ্ফল চেষ্টা শিল্পপথিকের, যেন ভ্রষ্ট রাজনীতি
যেন আমি সকল নির্ভুল অঙ্কে গোলযোগ, সাহিত্যে তীক্ষ্ণধী
সহ্য করি প্রেমতাপ, ছেড়ে-যাওয়া গাড়ি ইস্টিশানে
যেন আমি কিছু কিছু মানুষের জন্যে নয়, সকলের জন্যে বেঁচে আছি
যদি বেঁচে থাকা বলে, যদি একে চলচ্চিত্র বলে!

মাঝে মাঝে মনে হয়, কলকাতার পয়ঃপ্রণালীর
মধ্যে থেকে উঠে আসে, আজীবন যে শুয়ে রয়েছে শিশু
যার সামাজিক মাতা-পিতা নয় স্তম্ভিত ক্রীড়ায়
যে বোঝে সবার মধ্যে লক্ষণীয় স্থান নেই তার—
নিতে হবে, ছলে-বলে, কেড়ে ও কৌশলে
রক্তে ও চোখের জলে ভেসে যাবে গাঙ্গেয় কলকাতা…
শিরার সড়ক খুলে ঢালা হবে প্রসিদ্ধ বিদ্যুৎ
জ্বলবে ও জ্বালাবে তাকে এবং কলকাতা জ্বলে যাবে॥

দূরে ঐ যে বাড়িটা

দূরে, ঐ যে বাড়িটা দেখছো
এক সময় ওখানে বহুদিন ছিলুম, ছোটো
মশারির ভেতরে ছোটো ছোটো হাত-পা
সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার বাইরে ঐ
আপন মশারির ভেতর দূরে ঐ যে বাড়িটা দেখছো
এক সময় ওখানে বহুদিন ছিলুম।

আজ এখানে আছি।

সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার ভেতর
কিন্তু আমার মশারির বাইরে—

খারাপ নেই। আগেও ঠিক যেমনটি ছিলুম
আজো তেমন।
গা গত্তি ভরে শ্যাওলা, ছোটো
হাত-পা বড়ো কিন্তু কাঁকালসার।
যাবার আগে বোঝা হালকা রাখাই রীতি,
নইলে যে বাহকদেরই কষ্ট॥

কার জন্যে এসেছেন ?

অদ্ভুত ঈশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন মৃন্ময় উঠোনে
একদিকে শিউলির স্তূপ,
অন্যদিকে দ্বাররুদ্ধ প্রাণ
কার জন্যে এসেছেন—
কেউ কি তা স্পষ্ট ক'রে জানে ?
ঈশ্বর গাইছেন গান, তাঁর পথশ্রমে ক্লান্ত ধুলো
লেগে আছে দুটি পায়,
তবু তা স্পন্দিত হলো নাচে
কয়েকটি চিট্‌কেনা ছোটে
চেতনার আনাচে-কানাচে
একটু গেলে, শিমূলের তুলো···
ঈশ্বর কাঁদছেন একা,
সভায় যে কাঁদে সে সংসদে
মানুষের শুভ পণ্য বিক্রি ক'রে দেশবন্ধু সাজে
বন্যার আখুটে বালি সভ্যতা গঠনে লাগে কাজে
এই বলে যে ভাষায়,
সে কখনো ঈশ্বর ছাখে নি !

আমার ঈশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন সবার উঠোনে
একদিকে শিউলির স্তূপ, অন্যদিকে দ্বাররুদ্ধ প্রাণ
কার জন্য এসেছেন—
কেউ কি তা স্পষ্ট ক'রে জানে ?

আমাদের সম্পর্কে

ঈশ্বর থাকেন জলে
তাঁর জন্য বাগানে পুকুর
আমাকে একদিন কাটতে হবে
আমি একা—
ঈশ্বর থাকুন কাছে, এই চাই—জলেই থাকুন !

জলের শান্তিটি তাঁর চাই, আমি, এমনই বুঝেছি
কাছাকাছি থাকলে শুনি মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিন
সম্পর্ক রাখাই দায়
তিনি তো মানুষ নন !
তাছাড়াও, দূরের বাগানে
—থাকলে, শূন্য দূরত্বও
আমাদের সম্পর্ক বাঁচাবে ॥

তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল

আমার হাতের উপর ভারি হ'য়ে বসেছে প্রেত
ফুটপাতে শব্দ হয় ক্রমাগত
বৃষ্টির মুখ-ঝোঁকা মেঘ দূরে সরিয়ে দিলো হাওয়া
আমরা বিকেলবেলা চাঁদ দেখেছিলাম
তরমুজের লাল কাটা ফলার মতন ধরণী সবুজ চাঁদ

পৃথিবীতে যতো কঠিন সমস্যা ছিলো সব চাঁদের নিচে জড়ো হ'য়ে ততো
কঠিন ছিলো না আর
চাঁদের মতন কোমল, পাংশু ছিলো জীবন আমাদের—জীবনাকাঙ্ক্ষা
পৃথিবীতে বদনা-গ্যাড়ু পরিষ্কার ছিলো সোনার মতন
সোনার মতন মুসলমান নেমে গিয়েছিলো ওজু করতে
ওদের আল্লা করাতে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছে কাল
তার কাশফুল উড়ছিলো হাওয়ায়—তার কানের পৈতা হয়েছিলো
নির্ঘাত কুটি কুটি
কুশাসনে বসতে আমার ভালো লাগে না
ভালো লাগে না আমার ইন্দ্রজাল—মোহরের গল্প
আলিবাবা ভালো লাগে না আমার
ভালো লাগে না আমার সাধারণতন্ত্র—দেহ বিক্রি
আমেরিকার কোনো কিছু ভালো লাগে না আমার—
কেনেডির মৃত্যুই আমার ভালো লেগেছিল।

আকাশমণির মাথায় হাওয়া লাগছে
ফুল-বেলপাতা সমস্ত আমার হাত থেকে পড়ে গেলো
ডাকছে তক্ষক—শিবের ধিঙ্গি লিঙ্গ করছে খাঁ খাঁ
মাঠ ভেঙে রোদ্দুর এসে পড়ছে গায়ে তার
দেবতার সবই আছে—ছাতা নেই—নেই ওয়াটার প্রুফ
বৃষ্টির বিরুদ্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায়
দেবতাদের দেশে ইংরেজি নেই—হিন্দী নেই
নেই ভাষা কোনো আর
ইংগিতে ইংগিতে বাংলাদেশের মতন কথা আছে তার
আছে যোগাযোগ—আছে কলংকের কাল—
আছে চলাফেরা

দেবতাদের দেশে ইংরেজি নেই—হিন্দী নেই
আছে লরির আওয়াজ, মুক্তি-যুদ্ধ

আছে গড়নির্ণয় দেয়াল-ঘড়ি
আছে সবই যাকে তোমরা বলো 'অ্যাসেট্' !

.

মৃত্যুর অনেক আগে জন্মেছি আমরা—
জন্ম আগে—মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ,
পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের
সেখানে মাইল-পোস্ট নেই—নেই টেলিফোন-তার
মৃত্যুর কাছে যেতে হলে পথ—
পথের পরে পথ ফেলে যেতে হবে আমাদের
তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল
আছে কুলুঙ্গি, দেয়ালগিরি
আছে আসবাব উপঢৌকন মেহগনি-খাট পাশবালিশ
আছে পিকদানি পানের বরজ কাবুলী কলাগাছ
আছে ঘেটো রুই হাতছানি শ্যাওলা দাম
আছে প্রকৃত পিছিয়ে-যাওয়া শিশু ভোলানাথ শ্মশানের ছাই

তুমি না দিলে, আমার নয় কিছুই
কেননা, তোমায় আমি বিবাহ করেছি—
তোমার খেয়েছি লালা, কেটেছি পকেট—বগলের খাঁজে
উপুড় ক'রে দিয়েছি পাউডার-কৌটো
তোমাকে ভালোবেসেছি ভালোবেসেছি
যেমন ক'রে কুকুর ভালোবাসে যেমন ক'রে মশারির গর্তে গর্তে মশা বসে যায়
মৌমাছির মতন মাংসাশী
পৃথিবীতে বাঁচার কোনো প্রয়োজন ছিলো না—
বৈতরণী পার হ'য়ে তারাপীঠ যেতে হয়
আমাদের এঞ্জিন আমাদের লাল-হলুদে-মেশা বগিগুলো ফেলে গিয়েছিলো
পথেই !
শান্তিতে কিছুদিন বিদেশে থাকা চলে—দেশের অদ্ভুত
গোলযোগ বিড়ম্বনা ভালো লাগে আমাদের চিরদিনই
গাধা ভালো লাগে, ভালো লাগে র‍্যাদার উপর কাঠ-বরফের কুঁচি

পরিপ্রাণহীন খাটা পায়খানা ভালো লাগে আমাদেরও—
আমাদের দেশের যা কিছু আছে—পেঁপে গাছ
ভালো লাগে আমাদের—আমরা সুখী !

['তুমি আছো—ভিতের উপরে আছে দেয়াল' অক্ষর কটির পিছনে যেন এমন অর্ধসত্য রাখা যেখানে ভিত ছাড়া দেয়ালের স্থাপনও সম্ভব। পদ্যটির কাটা ছেঁড়া শরীর-ব্যাপী তিতিবিরক্ত ভাব আছে, তা লেখকের তৎকালীন মানসিক অবস্থার পরিচায়ক। অহোরাত্র বহিঃসেবনের পর সকালে কম্পিত আঙুলে ততোধিক দাঁড়িকমাহীন একটানা চলচ্ছবি—অর্থ অনর্থের মাঝামাঝি। ধর্ম-মূলক দাঙ্গার প্রতি ঘৃণাও আছে। ইতস্তত গ্রামের ইতস্তত ছবি লেখকের বাল্যস্মৃতি—চব্বিশ পরগণার বাদল দেউল চলনবিল, বামুন-পুকুর, মুসলমান-পাড়া, রেলইস্টিশান, মৌচাক প্রভৃতির—সর্বোপরি, অতীত আর অস্তিত্বের মুহুর্মুহু গোলযোগ আর কোলাহলের উপর দাঁড়িয়ে আছে এক বিহ্বল আর অর্ধসচেতন মূর্তি যা তোমার, নারীর চিরন্তন অভিপ্রায়-মাখা]

জন্মে থেকেই মাটির ওপর

জন্মে থেকেই মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়তো
ফাটতো মাথা ছিঁড়তো হাতা জামার
উঁচুয় উঠে ভয় পেতো সে নামার
নামতে গিয়ে অন্ধ চোখে হোঁচট খেয়ে পড়তো।

এমনি ক'রেই ভাঙতে-ভাঙতে ভাঙতে-ভাঙতে কবে
দিন ফুরোলো সন্ধ্যা যখন হবে
একাকী এক গাছ ছিলো, তার মাথার ওপর চড়তো।

এছাড়া তার কাজ ছিলো না কোনো
খানিক চোখের দেখা এবং খানিকটা দুঃস্বপ্ন
বাগান পুকুর উঠোন জুড়ে গেরস্থালি গড়তো।
কিন্তু, সে তো জন্মের থেকেই মাটির ওপর পড়েছে

বস্তু থেকে নিচ্ছে বিকাশ, আর কিছুটা গড়ছে
মনের মতন বনের মতন—যেমন লোহায় মরচে,
এবং সে তো জন্মে থেকেই মাটির ওপর পড়েছে ॥

তাঁকে

কখনো সমুদ্রে তাঁকে করো সন্ধান
কখনো পাথরে
কখনো হেমন্তে শান্ত মানসিক ঝড়ে
বৃষ্টিতে খরায় ফুলে শিকড়ে কখনো
কে যেন বলেছে : দেখো, শোনো—
কিছুই বলো না তুমি এক পা বাড়িয়ে
যে যেখানে আছে থাক্, শিকড় নাড়িয়ে
তোলার সরল কাজ তোমার তো নয়!
তুমি শুধু ক'রে যাবে প্রবৃত্তি সঞ্চয়
আর বাকি
তোমাকে যা ছোঁবে না, তা ফাঁকি।
কখনো সমুদ্রে তাঁকে করেছি সন্ধান
কখনো পাথরে
কখনো হেমন্তে শান্ত মানসিক ঝড়ে ॥

জল পড়ে

সূর্য যায়, সূর্য ডুবে যায়
তখন দরজায় জল পড়ে
কে যেন ছড়ায়
শাঁখ বাজে ধূপধুনো পোড়ে
কয়েকটি বাদলপোকা কেন যেন ওড়ে ?

ওদিকের মাঠে হাটে চাষা
আকাশেও সোনালি বাতাসা
জল পড়ে বুকের ভিতরে
দুরন্ত বাদলপোকা ঘুরে ঘুরে ওড়ে
জল পড়ে, শুধু জল পড়ে ॥

রক্তের দাগ

বিষণ্ণ রক্তের দাগ রেখে গেছে অন্ধকারে ফেলে
মুণ্ডহীন তরুণের উজ্জ্বল বিমূঢ় এক দেহ।
খোলা ছিলো গলির গৃহস্থ জানলা আর
কোষমুক্ত তরবারি ঘাতকের হিংস্র সাংঘাতিক
একটি জিজ্ঞাসা নেই ওই দৃষ্টিহীন দর্শকের
চোখে বা কণ্ঠেও নেই একটি অস্পষ্ট উচ্চারণ :
কেন এই নিদারুণ হত্যা ? কেন মায়াহীন ক্রোধ !
এই বাল্যকালে ওই আমার সন্তান কী করেছে ?
কোন্ অপরাধে এক প্রাণবন্ত জীবন আঁধারে ?
ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, ও শুধু বিপ্লব চেয়ে দোষী ॥

ঐ গাছ

একটি নিষ্পাপ গাছ আমাদের মাটিতে বসেছে
বাস্তুর নিকটে আছে, বুকভরা মায়ার নিকটে
পিতৃপুরুষের স্নিগ্ধ স্মৃতির মতন কেশপাশ
এলিয়ে রয়েছে ছায়া, সীমাহীন রোদের ভিতরে—
যেন ঠাণ্ডা প্রেম তার কুয়োতলা নিয়ে আছে কাছে
মানুষের অগোছালো শান্তি ও অগ্নির
পার্শ্বপার্শ্ব মেলে নিয়ে, প্রকৃত চিন্ময়
রূপ ভায়, ঐ গাছ আমাদেরই মাটিতে বলেছে ॥

তিনি এসে উঠেছেন

আমি জানি, দিনের সংস্পর্শে তাঁকে চিরদিনই দেবেন বিদায়…
তিনি এসে উঠেছেন আমাদেরই নিবিড় বাড়িতে
তাঁর জন্ত, একটি অস্পষ্ট ধূপ জেলে দেওয়া ভালো, এইখানে
তাঁর জন্য বেঁধে-রাখা একটি হরিণ—ঐ গাছে।

হরিণ সম্পর্কে আমি কিছুদিন লেখাপড়া করেছি; বিস্তর…
হরিণ সম্পর্কে আমি কিছুদিন—গণ্ডগ্রামে ঘুরে
চাষীদের, হরিণের ঘাস খাওয়া এবং না-খাওয়া
দেখেছি যথেষ্ট আমি…তার মানে, এই লক্ষ্যহীন
ভালোবাসাবাসি থেকে পূর্ণ থাকা অথবা না-থাকা॥

পাথর গড়িয়ে পড়ে
গাছ পড়ে বোধে

হঠাৎ হারিয়ে গেলো, এলোমেলো হাওয়া, ভুল চাঁদ
তার নিচে দাঁত খুলে খোয়াই পেতেছে নীল ফাঁদ
বনের ভিতরে হিংস্র জন্তু আছে, মানুষেরা আছে
গাছের শিরার মতো সাপ আছে ছড়িয়ে সেখানে—
এখন কোথায় সে কে জানে ?
এখন কোথায় সে কে জানে ?

তাকে ছন্নছাড়া করে অগ্নির গণ্ডূষ
মানুষের সব হুঁশ ছেড়ে তাকে পাথর করেছে
পাথরের খেলাধুলা নদীর ভিতরে—
নদীতে কোথায় সে কে জানে
নদীতে কোথায় সে কে জানে ?

খুঁটিয়ে দেখেছি বন, বনাঞ্চল, গাছের শিখরে
যদি সে আনন্দ কিছু করে
গভীর রাত্রের খেলা যদি তাকে পায়
আমোদ বিন্যস্ত থাকে লতায় পাতায়
যদি তাকে টানে
এই প্রান্ত থেকে ভুল চাঁদ অন্যখানে—
তাকে পাওয়া!
কেন বা সন্ধান দেবে এলোমেলো হাওয়া?
—ইন্দ্র, ইন্দ্র, ইন্দ্রনাথ? প্রতিধ্বনি ফেরে
বিপুল অসহ্য শব্দে ভাঙে নির্জনতা।

পাথর গড়িয়ে পড়ে, গাছ পড়ে বোধে
মানুষ হারায়, তা কি মানুষেরই ক্রোধে?

নদীর পাশে সবুজ গাছে

দুঃখিত সে নদীর পাশে একটি সবুজ গাছের মতন
দুঃখিত সে আলোর কাছের এক লহমা ছায়ার মতন
দুঃখিত সে দুঃখিত সে—
যেমন কথা বললো এসে
অমনি সুখের ঝড়ের ঝাঁটায়
সতীন কাঁটা উড়েই গেলো!
উড়লো ধুলো ও পরচুলো, ঠোঁটের প্রান্তে উঠলো বাঁশি,
দুঃখিত সেই মুখটি জুড়ে জ্বলে উঠলো সুখের হাসি···

নদীর পাশের সবুজ গাছের ফুটলো কি ফুল অনন্তকাল?

যে-কিশোর হৃদয়ে বসেছে

গাছের পাতার থেকে বৃষ্টি নেয় ধুলোকে সরিয়ে
শিকড়ের থেকে তা কি নিতে পারা হবে স্বাভাবিক ?
মানুষের বাহিরের ধুলো যদি নিত বৃষ্টি মুছে
তাহলে অন্তর হতো বহুদূর মালিন্যবর্জিত।

গাছেদের মানুষের দুজনের জীবনও আলাদা।
মৃত্যু হয়তো এক, হয় তো অপৃথক, নিশ্চিত একাকী !
তার কোনো ঘর নেই, গেরস্থালি নেই, শান্তি নেই
একক অশান্ত তার জীবনের ছিদ্রে বসে মাছি।

গলিত মাংসের স্তূপে তার সাক্ষ্য কীট ও শকুন।
এভাবেই বেঁচে থাকা, মরে গিয়ে, মায়াহীন হয়ে,
পাথরের মতো নাকি ? হিংস্রের বিপ্লবী তরবারি—
নাকি তার মতো ওই যে-কিশোর হৃদয়ে বসেছে ?
বয়স হয়েছে ঢের, দেখেছি বস্তুত খুঁটিনাটি
নিতেও হয়েছে বহু মিথ্যা—তাকে, সত্য ব'লে খাঁটি।

কিছুক্ষণের জন্যে

রোদ্দুরে কলকাতা পুড়ছে, উড়ছে ধুলো চৈত্রের বাতাসে
তারই মধ্যে কৃষ্ণচূড়া ছায়া ফ্যালে আশ্লেষমধুর
যুবক যুবতী বসে যেন হাঁস পুকুরের পাড়ে—
উলোটপালোট মুখ গুঁজে থাকে পালকে পিঠের
এই দৃশ্যে একদিন আমারো সংযুক্তা ছিলে, নারী,
আমার নিকটে ছিলে, কাছে ছিলে, কলকাতায় ছিলে।

সেই কলকাতা আজ পুড়ে যাচ্ছে বলে দুঃখ হয়
রোদ্দুরের মধ্যে বসে তোমরা কী করে শান্ত আছো ?
ধুলোর বাতাস তুচ্ছ, তুচ্ছ শহরের পরিশ্রম
এই স্থির পাথরের পবিত্রতা কোথায় পেয়েছো ?
কতোদিন বসে আছো একভাবে—বয়স বাড়ে না ?
ভালো হয় ? যদি আমি গিয়ে বসি তোমাদের পাশে—
কিছুক্ষণ !

মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি

[শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি]

মানুষের মৃত্যু হলে মানুষের জন্যে তার শোক
পড়ে থাকে কিছুদিন, ব্যবহৃত জিনিসেরা থাকে
জামা ও কাপড় থাকে, ছেঁড়া জুতো তাও থেকে যায়
হয়তো বা পা-দুখানি রাঙা হলে পদচ্ছাপ থাকে
অনুপস্থিতি আর মরা পদচ্ছাপ রেখে ওরা—
যাদের পিছনে ফেলে দিয়ে গেলে, তারা মনে করে
তোমার স্বভাবস্মৃতি তোমার ভালোর সীমাহীন
তোমার সমগ্র নিয়ে আলোচনা হয় না কখনো
হতেও পারে না বলে মনে হয়, হতে পারে নাকি ?
মৃত্যুর দুদিন আগে তোমাকে কী সুন্দর দেখালো !

গল্প বলেছিলে বটে, আর কোনো কাজ বাকি নেই
ঋণ নেই কারো কাছে, পাওনা নিয়ে করিনি তদ্বির—
আমি সুখী, তুমি জানো সুখ কাকে বলে ?
সুখ সেই বিষণ্ণতা যে আমার কোলে বসে থাকে

অনন্যা একাকী কন্যা সেও তার নিজস্ব গৃহের
বারান্দায় বসে থাকে রাজার পুত্রের খেলাঘরে—

তারো কাছে আমি এক বাতিল বাবার
স্মৃতি ছাড়া কিছু নয়—অতীতের বিস্মৃত মধুর !

নিজেকে সরিয়ে নিতে আজ, পূর্ণ আছি বলে
জানিনা কখনো যদি পূর্ণতায় ইঁদুরের দাঁত
চাষ্ কেটে বসে আর ফুটো করে সজল বালিশ
তাহলে উজ্জ্বল তুলো বাতাস ভাসাবে
পঙ্গু অনর্থক দিন বৃথা চলে যাবে
দক্ষিণদুয়ারে এসে দাঁড়াবে নির্ঘাৎ
চতুর্দোলা নিয়ে যম—
অপমান লাগে···

মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি ॥

নিঃশব্দচরণে প্রেম

নিঃশব্দচরণে প্রেম এসেছিলো দুয়ার মাড়িয়ে—
ঘরে ও ঘরের বাইরে তখন ছিলো না অন্ধকার
আলো ছিলো, ভালো ছিলে —ছিলো তা, যা থাকে না কল্পনে
একটি মানুষ ছিল সুন্দরের অপেক্ষায় বসে—

নিঃশব্দ চরণে প্রেম এসেছিলে দুয়ার মাড়িয়ে
যেন সরীসৃপ, যেন গন্ধ যেন হৃদয়ের দোষ
উল্লেপসোগ্যতা ভেঙে, বাদামন ভেঙে এসে গেছে।

মানুষও তো বৃদ্ধ হয় ! ভোগের নদীতে পাড় ভাঙে
শরীরে, দুয়ারে, কাঠে কীট বাঁধে উপযুক্ত বাসা
গিঁট ভাঙে গাঁট ভাঙে—ভেঙে যায় উজ্জ্বল পাখা

গৃহবাড়ি ধ্বসে যায় পুরাতন প্রেমের কম্পনে
যে যায় যেভাবে যায় ভেঙে ভেঙে দিয়ে যেতে থাকে—
নিঃশব্দচরণে প্রেম তবু আসে দুয়ার মাড়িয়ে।

এবার আমি ফিরি

এবার আমি ফিরি ফেরার কুতূহলে
এবার আমি ফিরি ফেরার কামনায়
অনেক হলো দিন অনেক হলো বলে
এবার আমি ফিরি ফেরার কুতূহলে
এবার আমি ফিরি ফেরার কামনায়
অনেক হলো দিন অনেক হলো হায়
দিনের বেলা ঘরে, ঘরের বেলা দিন
রাতের মেঘ সবই গড়ায়ে যায় জলে
নিজেরে সাবধান করিতে হবে খুব
পরেরে সাবধান করিবে তুমি আসি
তোমার ভুলগুলি তুমি কি ভুলে যাবে
তোমার ভুলগুলি আমি যে ভালোবাসি
এবার ফিরি আমি ফেরার বেলা হলে
এবার ফিরে যাই ফেরার কামনায়
দিনের বেলা ঘরে রাতের মেঘ করে
রাতের বেলা ঘরে দিনের মেঘ নাই।

জানিনা কোথায় শব্দ

এ জলে নেভানো শব্দ, কার মতো—আমূল, অংশের
প্রসঙ্গে মেলাবে মুখ ?

কালো কয়লা টুকরো যে অগ্নিকে
ধ'রে রাখে, তার মতো ? নাকি তাম্রকূট নীল বিষ
নিশ্চিন্ত শিশিরে প'ড়ে মুছে যায় চোখের আড়ালে
মানুষের মৃত মুখ জানি পাবো দুই পা বাড়ালে
যদি পা বাড়াই, যদি নেমে পড়ি ছাউনির পাড়ায়
টুপির পাহাড় যদি অলঘুশ গাছপালা নাড়ায়
তখন শব্দকে কিছু খুঁজে পাবো, যা বাংলার ইট,
বানাবো মন্থর বাড়ি পারম্পর্যে ঘাড় ধ'রে গেঁথে
তখন সনেট লিখবো কিংবা গায়ে-পড়া চতুর্দশী
লোকে বলবে, মিস্ত্রি বটে, ঘটে-পটে চূড়ান্ত স্বদেশি !
ঘুরে মরি গো-শকটে কিংবা যতো চাঁদ-খেকো গলির
নিশ্চিত সুড়ঙ্গে, পড়ে গুমোট গরম ইলেকট্রিক
গায়ে, বুকে হেঁটে যেতে শামুকের মতন করুণ।
এবং যা লাগে, ছায়া, পিছু ফিরি—ছায়া পিছু ফেরে।

ওখানে কি শব্দ ছিলো ? কলকাতার ধনলম্পটের
মতন স্বচ্ছন্দ কিংবা মধ্যবিত্ত ও মর্মুটে
ছেঁড়াকাঁথা শব্দ ছিলো ? লটারীর স্বপ্নের গোলাপি
শব্দ ছিলো ঘামে ভিজে ; ছাতা প'ড়ে নরম নৈরাশে ?
জানিনা, কোথায় শব্দ জলজ্যান্ত মোহের ভিতরে,
গর্ভে যেন সর্পশিশু, লেজ ; কিংবা গন্ধের মতন
উষ্ণ ও প্রগল্‌ভ টান, গান যেন মৃদঙ্গ ভজুর

টেবোর বাংলোয় রাত

কে যে কোন্‌পথে যেতো ? কোন গাছ কার চোখে
প্রথম গভীর শব্দ
কোন নদী, পাথরেই চাঁই ?
পথের মরুম, কোন চেয়ারে কে বসে ভেবেছিলো
জীবনের সমর্থন এখানেও, মরতে কেন আসা ?
পকেটে, জেব্‌-এর খাঁজে খুচরা ঠাস-কাগজ নিয়ে
এ-কোন মক্ষিকা-ভালোবাসা ?
কে যে কোন্‌পথে যেতো—আজ মনে পড়ে ?

শুকনো হয়ে আসে পাতা, ছেড়ে জল, শুকোয় পাথর,
এদিকে ব্যবস্থা তাই ; ধরে-রাখা এখানে কঠিন
এবং দরকারও নেই, শুধু পথে পা দিলে চঞ্চল
ক্রমাগত চোরাটানে তোমাকে ফোটাবে যেন ছুঁচ
বনের কাঁথায়···

আর তুমি যাবে, যেন চোখ বুজে
ডিঙোবে পাহাড় বন সেগুনের শালের কেন্দুর—

কে যে কোন্ পথে যেতো—আজ মনে পড়ে ?
শহরে ট্রামের তার ছিঁড়ে গেলে, স্থগিত দুপুর
তক্ষক পাথরে ঘষে কণ্ঠ তারই কাছে, ভাবো দূর
এদিকে ব্যবস্থা তাই, ধরে-রাখা এখানে কঠিন
এবং দরকারও নেই—

আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি

ছাতার নিচে ছড়িয়ে বসছি—বৃষ্টি পড়ে রাত দুপুরে
আকাশে চাঁদ শায়া শুকোচ্ছে কি নরম জোছ্‌না-আলোয়
আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি, ছাতার নিচে রাতদুপুরে
চঞ্চলতার ঝড়কে বলি, বেশতো আছি মন্দে-ভালোয়

তুমি বরং বকুলগাছের মগ্‌ডালে দাও ক্ষিপ্র ঝাঁকি—
সঙ্গিনী চায় পাঁচটি কুসুম, উসুম-কুসুম সঙ্গে নিতে
আমরা পাথর মস্ত পাথর—তার কাছে সন্দেহ জোনাকি
তুচ্ছ এবং দরজিও নয়, তার হাতে কি মানায় ফিতে ?

আমরা দুজন ছড়িয়ে বসছি—ছাতার নিচে রাতদুপুরে
চঞ্চলতার ঝড়কে বলি, বেশ তো আছি মন্দে-ভালোয়।

দশমী

আগুনে তার মুখ পুড়েছে হঠাৎ যখন সন্ধে
বাতাস খুঁটে গা খেয়েছে, ফাঁক ভরাতে মন দে
নয়তো পাঁচিল পড়বে টলে, শেষরাতে তার সময় হলে
বাতাস বাঁধে ঝড়ের মাথা ধুলো-বালির গন্ধে
আগুনে তার মুখ পুড়েছে হঠাৎ যখন সন্ধে।

জলের মধ্যে দেহটি তার মাছের দাঁতে কাটছে
উলুক ঝুলুক শালুক ফুলের পাতায় দেহ চাটছে
ভালোবাসায় হুলুস্থুলুস এইভাবে তুই দুঃখ ভুলুস
পোড়া চাঁদের আকাশে মেঘ ঘুমের ভিতর ফাটছে
জলের মধ্যে দেহটি তার মাছের দাঁতে কাটছে।

কষ্ট হয়

আমার ভিতরে কাঁদে
বর্ণচোরা শিশু এসে মৃত্যুর আহ্লাদে
কাঁদে, কথা বলে কাঁদে।
কুয়াশা, মেঘের ফাঁদে চাঁদ
মানুষেরই যেন অপরাধ
মানুষেরই শুধু অপরাধ।

সৃষ্টি ও দর্শন আছে বলে
মানুষের উচ্ছিষ্ট কমলে
ধরে লোভ, হিংসা, অগ্নিশিখা
অস্তিত্ব পোড়াচ্ছে, কনীনিকা
ক্ষার করে বুকে দেবে বলে—
মানুষেরই মায়ার কমলে
ধরে লোভ, হিংসা, অগ্নিশিখা
এ সমস্ত আমাদের দেখা
এ সমস্ত আমাদের শেখা।
মানুষের ভিতরে পাহাড়ে
নদীর ঘুমন্ত মুখখানি
জানি আমি, এখবরও জানি

তবু কাঁদে, তবু কেন কাঁদে
কাদের কাঁদের শিশু ভিতরে, অবাধে ?
কষ্ট হয়।

যখন একাকী আমি একা

এখন সন্ন্যাসী দুইজন—
একজন আমি আর অন্যজন আমার পিতার
মমতাবিহীন চক্ষু
মাঝেমধ্যে রাতে দেন দেখা
যখন একাকী আমি একা
মাঝেমধ্যে রাতে দেন দেখা
কেন তাঁর নামত সন্ন্যাস
কেন তিনি মাত্র মায়াহীন
মনে ভাবি
এমন দেখিনি তাঁকে আগে
কোনোদিন
এখন সন্ন্যাসী দুইজন—
একজন আমি আর অন্যজন আমার পিতার
মমতাবিহীন চক্ষু
মাঝেমধ্যে রাত্রে দেন দেখা
যখন আমি একা ॥

নিচে নামছে

আজ একটা গোটা দিনই বাড়ি থেকে বেরুনো হয়নি
উদ্‌ভ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে, নড়ছে গাছের মাথা
বাতাসে হিম আর ছন্নছাড়া জলকণা ঝাপ্‌টে পড়ছে জানালায়
আলনায় রাখা আটপৌরে কাপড়ে গুমো
গন্ধ, যেন জালায় রাখা পুরনো চাল—
ভাতে বাড়ে ! বৃষ্টি ছাড়ে না-ছাড়ে বাড়িতেই আছি
কট্‌কট্‌ করে ব্যাঙ ডাকছে ডোবায়
বাদলা পোকা উড়ছে এলোমেলো

সাপের জিভ থেকে বিষ খসে পড়ছে
পলের পাহাড়ে, স্বর্গের ফুল কোঁড়ক-ছাতায়
বৃষ্টি ঝরছে উদ্‌ভ্রান্ত
গাছতলায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়েছে গাইবাছুর
ডাঁশ লাগছে পালানে
গা-জ্বালানে ধোঁয়া ওপরে উঠছে না আর
কার্নিসে কাক
বসে থাক।

যতোদূর চোখ যায় এক কোমর উলু
মাঝেমধ্যে খাড়া তালঝাঁকড়ায় বাবুই-এর বাসা
নিজেকে ভালোবাসতে এরকম মেঘবৃষ্টি
চাই, নিজের কাছে চাই চুপচাপ বসে থাকার সময়
শিশু শালের পাড়ায় রাঙামাটি হাঁ করে গিলছে
বৃষ্টি, যতোদূর দৃষ্টি যায়—কি রকম
গা ছমছমে সবুজ, চোখ তুললে ছাই
মেঘের রং-বর্ণ আর মায়াজাল, কেন্দ্রে বসে
জাল বুনছে বুড়ো মাকড়সা, কেউ বসে
নেই, আলস্যের পাথরও গড়িয়ে গড়িয়ে
নিচে নামছে।

এই সিংহাসন, তার পায়ে বাজ

এই সিংহাসন, তার পায়ে বাজ, উড্ডীন ডানায়
আমাকে জড়তা থেকে নিয়ে যায় নক্ষত্রের দেশে—
'নক্ষত্র' অভ্যাসে লিখি, আমার নক্ষত্র এইসব
স্থানীয় গেরস্তঘর, কিংবা দূর কুহকী বাংলোয়
নিয়ে যায়, ভালোবাসে—ঐ বাজ চাঞ্চল্যে অধীর
হয়ে পড়ে বস্তুভারে, তবু মুক্তি করে না বর্জিত

আপন অন্তর থেকে, ঢেকে রাখে, জানায় না ঘোর
উড়ে পুড়ে চলে-যাওয়া বাসনার মর্মের আত্মজে।

মুক্তি, মুক্তি করে লোক, সব মুক্তি বন্ধনে জড়িত।
শাপের আশ্লেষ যেন বিষে ফেটে চৌচির ভুবন
অমৃতের পাত্র ভাঙা, কানাতে শিল্পের কারুকাজ
মেখলাসুনীল মিনে, কার কাছে রাজসিংহাসন!
কিন্তু যেতে হবে দূরে, আত্মপরিচিত পথঘাট,
না গেলেই বিঘ্ন হবে প্রিয় যেন প্রোষিতভর্তৃকা।

চলে গেলো

সেই প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফিরে আসে পাগল কিশোর
যেখানে অনেকে ছিলো, শিকড় বসিয়ে তীব্র ভূমি
দখল করে ও সুখ অনুভব করেছে বিস্তৃত—
স্বাভাবিক অগ্নি-বৃষ্টি-বাতাসের বন্ধুতা ছিনিয়ে।

প্রতিষ্ঠান কেন গেলো? একাকিত্ব অসহ্য হওয়ায়?
কিম্বা কোনো চোরা টান জোর করে সংযুক্ত করেছে
মানুষে-সমুদ্রে-জলে, ভয়াবহ বশ্যতার কাছে—
একদিন।

প্রতিষ্ঠান ভাঙা, মানে নিজেকে কুঠার করে তোলা॥
না হলে হবার নয়—রসে-বসে সম্পৃক্ত সংসার।
গিলে খায় স্বাধীনতা, মুক্তমাঠ, বাতাসের রাশি,
একদিন, আসি—বলে, চলে যাওয়া, বাধ্যতামূলক।
যে যায় যে যেতে পারে সে অনেক বলিষ্ঠ পাগল,
কিশোরবেলার নাগপাশে বন্দী খেলাচ্ছলে ভরা—
হোক, তবু চলে গেলো, এমন কি বলেও গেলো না॥

মানুষের মধ্যে আছো

তোমাকে পাচ্ছি না খুঁজে, ঘাড় গুঁজে শস্য আর খড়ে
খুঁজে দেখছি আছো কিনা ! প্রাসাদের প্রতিটি ইটের
গা থেকে প্লাস্টার ছেনে খুঁজে দেখছি আজন্ত অক্ষর—
স্টেশন প্লাটফরমে গিয়ে মানুষের মুখের ধুলোয়
ফুঁ দিয়ে, উড়িয়ে দেখছি তুমি কিনা, মুখচ্ছবি মনে
এখনো বিষণ্ণ হয়ে পড়ে আছে শেফালির পাশে—
উঠোনে, বেড়ার ধারে যেন বাজবরণ লতার
মতন উৎসুক, সুখী গেরস্ত বাঁচাতে !

আগে কাছে থাকতে, আগে সারাক্ষণ থাকতে কাছাকাছি
যেভাবে মানুষ থাকে, পাথর ইটের মতো নয় ;
অঙ্গে অঙ্গে লেগে থাকতে শাঁড়াশির মতন মাথুর।

সহসা কি ঝড়ে হলে নিরুদ্দেশ ? এই লুকোচুরি
খেলার প্রধান কাল ছেড়ে একি দুঃসময়ে, দূরে…
মানুষের মধ্যে আছো ? নাকি স্থির গাছের ভিতরে ?

দুঃখ

কবি যদি দুঃখ পায়, কলকাতাও দুঃখ পেতে থাকে।
অথচ সকলে বলে, তার মতো নিষ্ঠুর দেখিনি—
খল, শঠ, প্রবঞ্চক, হৃদয়বিহীন বৃদ্ধা লোল
এবং কখনো টেনে গৃহ থেকে শিশুকে চাকায়
ব্যাভলায়, নিহত করে ; ফেলে দেয় নর্দমার ধারে
গরীব দুঃখীকে, হায় কলকাতা কি দুঃখ পেতে পারে ?
আমি জানি দুঃখ পায়, কেঁদে হয় কলকাতা আকুল
মনের ভিতরে, তুমি একবার কান পেতে শোনো

মধ্যরাত্রে ফাঁকা রাস্তা, কান পাতো রাস্তার উপরে—
শুনবে, কে যেন কাঁদছে, মনে মনে দুঃখের নিঃশ্বাস
পড়ছে, যেন মেঘ ডাকছে নিচের গহ্বর থেকে রোজ
রোজই যাকে কাঁদতে হয়, সে কি আর দুঃখ পেতে জানে ?

জ্বলন্ত রুমাল

হৃদয়ের খুব কাছে পড়ে ছিলো জ্বলন্ত রুমাল
তার অগ্নি স্পর্শ করে শুভ্র মুখ পাগলের মতো
ছোঁয় আর কামড়ে ধরে, জিহ্বায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে—
স্বাদু ত্বক, হিম রক্ত, বুকের সংশ্রব ভরা খাঁচা।
মানুষের মধ্যে থেকে ভালোবাসা শূন্য হয়ে গেলে
তাকেই পাথর বলে ছায়ারোদে ওঠে মুখোমুখি—
যেন বা সরল গাছ খোয়াই প্রান্তরে পড়ে আছে।
এক দীর্ঘ পড়ে থাকা মানুষের মৃত্যুরও অধিক।

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন

[অংশ]

১

ছোট্ট হয়েই আছে
আমার, না হয় তোমার, না হয় তাহার বুকের কাছে
দুঃখ নিবিড় একটি ফোঁটায়—দুঃখ চোখের জলে
দুঃখ থাকে ভিখারিনীর এক মুঠি সম্বলে।
ছোট্ট হয়েই আছে
একের, না হয় বহুর, না হয় ভিড়ের বুকের কাছে।
একটি ঝিনুক তাকে
জন্ম থেকেই, একটু-আধটু, বাইরে ফেলে রাখে।

সুন্দরের হাত থেকে ভিক্ষা নিতে বসেছে হৃদয়
নদীতীরে, বৃক্ষমূলে, হেমন্তের পাতাঝরা ঘাসে
সুন্দর, সময় হলে, বৃক্ষের নিকট চলে আসে
শিকড়ে পাতে না কান, শোনায় না শান্ত গান
করতপ্ত ভিক্ষা দিতে বৃক্ষের নিকট চলে আসে।

৫

যদি কোনোদিন যাই মেঘের ওপারে
তোমাকেও নেওয়া যেতে পারে।
তারপরে, পথ নেই। ফুটে আছে ফুলের প্রদীপ
তুমি কি পোড়াবে কিছু? জ্বালিয়ে নেবে না সন্ধ্যাদীপ?
আরো কিছুক্ষণ যেতে হবে
পথ বড়ো সংকীর্ণ, কঠোর

তারই মধ্যে হাওয়া এলোমেলো—
বলে, শান্ত, কে এখানে এলো?

৭

হারিয়ে যারা যাচ্ছে এবং হারিয়ে যারা আসছে
তাদের বুকে ভাসছে পাথর, তাদের বুকেই ভাসছে
জল ছিলো, তা রক্ত হয়েই এবং আছে কান্না
তাই ভেসেছে পাথর তেমন নদীর মাঝে যাস না।

৮

একা লাগে ভারি একা লাগে
তোমাদের ছেড়ে এসে অমূল বৈরাগে
একা লাগে ভারি একা লাগে।
এখানে লাফায় ঘাসে পোকা

আঙিনায় মানুষের খোকা
এখানে দুরন্ত ঘাসে শোকা।
এখানে উদ্বেগ নেই মেঘে
দেখার মতন নেই জেগে
কেউ, একা দুঃখে ও আবেগে···
একা লাগে বড় একা লাগে।

১০

তুমি যেন নদী তার দুয়ার অবধি
কণোতাক্ষ জল এনে মুছাও দুঃস্মৃতি

যা কালো, কলুষ-ক্লিন্ন তাকে শুভ্র করো
তুমি যেন নদী তার দুয়ার অবধি।

তুমি যেন ধর্ম তাকে ধারণ করেছো
গর্ভে ; রক্তে প্রাণে মিশে হয়েছে মানুষ

সুখে দুঃখে লিপ্ত হয়ে হয়েছে মানুষ
তুমি যেন ধর্ম তাকে ধারণ করেছো।

১৩

মুখখানি যেন তার মতো
মুখখানি তবু কার মতো ?

১৪

এই যে আছি, থাকবো না আর
সময় হলে লুকিয়ে যাবার
তখন কি কেউ দেখতে পাবে
আমার সঙ্গে পথ হারাবে ?

কক্ষনো নয়, কক্ষনো না
আমি তো নই সবার চেনা!

১৫

বৃষ্টি নেই, মনে হয় বৃষ্টি পড়েছিলো।
উজ্জ্বল রোদ্দুরে তাকে ক্ষয়ে যেতে দেখেছে অনেকে,
অনেকে দেখেছে তাকে পালাতে মাঠের ঐ পারে
যেখানে মানুষ নেই, আছে শুধু পাথর প্রকৃতি,
খরতর হাওয়া নেই, আছে মৃদু মন্থর বাতাস
সেইখানে।
বৃষ্টি নেই, মনে হয় বৃষ্টি পড়েছিলো।

১৭

দুঃখ কিছু গোপন এবং দুঃখ কিছু কাছের
হয়তো আমার মধ্যেও তার বসার জায়গা আছে
দুঃখ কিছু পাথর এবং দুঃখ থাকে কাদায়
দুঃখ আছে বাইরে এবং ঘরদুয়ারে বাঁধা

দুঃখ কিছু জমির বুকের শস্য-খোয়া নাড়ায়
দুঃখ আমার সুখের ঘরে পারিস তো বাড়া।

১৯

একটু নেমে দাঁড়াও, যদি আমার কাছে দাঁড়াতে হয়
একটু উঠে এসো, যদি আমার কাছে দাঁড়াতে হয়
দুখানি হাত বাড়াতে হয়, বাহিরে টান ছাড়াতে হয়
একটু উঠে একটু নেমে আমার কাছে দাঁড়াতে হয়।

২১

পথ যেন পথেরই উপরে
দেহের সংস্রবে ঝরে পড়ে

ভাঙে না ব্যথার পাহাড়েরা
ঘাসের গভীরে চরে ভেড়া
রীতিমতো ঘাস হয়ে যায়—
যখন ভেড়াকে খুঁটে খায়।

২২

ঝিনুক কুড়াতে কত ছল
ঝিনুকে এখনো নীল জল!
গুঁড়ো গুঁড়ো পরিপূর্ণ বালি
জীবন যাপনে বাড়ে খালি।
কেউ কি কখনো মনে ভাবে—
ঝিনুক কুড়িয়ে দিন যাবে?

২৫

ভিতরে কে আছো আধো-ভাঙা
কার রক্তে পদতল রাঙা
ভিতরে কে আছো আধো-ভাঙা?
কেউ নেই ঘরের ভিতরে
কেউ নেই বুকের ভিতরে
তবুও কে যেন মনে পড়ে।
যখন তখনই মনে পড়ে।

২৭

তখনো গাছের কাছের কাছে ছায়া পড়ে আছে
কিছু পাতা, কিছু ফুল
মানুষের মধ্যে ভুল
পড়ে আছে।
কুড়োয়নি কেউ তাকে
মাঝেমধ্যে ঢেকে রাখে

আদর চাদর মেঘ আর পিছে চাওয়া
মানুষের মধ্যে আছে মানুষেরই ছায়া !

২৯

কার্নিশে বেড়াল কাঁদে, মাঝে মাঝে কান্না শোনা যায়
কখনো গভীর রাতে হিমঘুমে কাক কেঁদে ওঠে
কী যেন না পেয়ে এই ছন্নছাড়া গলির ভিতরে
মানুষ সতর্ক হয়ে, অন্ধকারে ফোঁপায় সর্বদা
আগুন যথেষ্ট আছে
কাঠ আছে
কর্তব্য রয়েছে
একমুষ্টি ভাত নেই, ভাতের গন্ধও নেই কোনো।

৩১

কেন এলে, কিন্তু, কেন এলে ?
পথের উপরে ঘাস, আগাছার দীর্ঘস্থায়ী মুঠি
ঘা ধরে ভেঙেছে ইট ঘেঁষ বালি পাথরের ছিরি—
এবং ভেঙেছে চাঁদ, টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে
জলের সর্বত্র।
এলে, কিন্তু, কেন এলে ?
সন্ধ্যেবেলা হাওয়া এলো, বৃষ্টি এলো, যুথাপেক্ষী ঝড়—
কোথায় উড়িয়ে নিলো, তাপিত সন্তপ্ত খেলাধূলো
বৈশাখের।
তুমি এলে, কিন্তু কেন এলে ?

৩৩

দেরি নেই, অসংখ্য সোনালি সুতো গাছে পড়ে আছে
পাতায় পাতায় তার নরম, কোমল তুলো আর
সোনালি তাঁতের পাশে কারিগর পণ্যের সম্ভার
নামিয়ে দিয়েছে।

দেরি নেই, জংলা শুঁড়িপথে
চলেছে হাটের লোক উঁচুনিচু খাড়াই পর্বতে
দেরি নেই ফুরোবে এক্ষুনি
সহজ কাজের দিন কান পেতে শুনি
সোনালি সুতোর টান, ফিসফাস, দূরে চলে যাওয়া···
ওঁরাও ক্রিশ্চান চারচে খাঁ খাঁ করে ধর্মের আবহাওয়া।

৩৬

একটু কথা কইলে ভালো
একটু সবুর সইলে ভালো
এক মুহূর্ত রইলে ভালো
নইলে কিছুই পাচ্ছো না।
এক গলা বুক ডুবলে জলে
আমায় ভালোবাসতে বলে
যখন তখন হাসতে বলে
—নইলে আমায় পাচ্ছো না।

৩৭

সহজ ভঙ্গিতে কথা, কিন্তু তারপরে
সুখের সন্তান পোড়ে দুচোখের জ্বরে
আমার সন্তান পোড়ে দুচোখের জ্বরে!
না হয় একাকী আছো, ভালো নেই মন
জীবনে কখনো নও একান্ত দুজন
তবু কি এভাবে কেউ সমর্পণ করে
উপবাস, একাকিত্ব, ভীষণ বিষাদ—
সহজ সন্তান পোড়ে দুচোখের জ্বরে।

৩৮

মনীষার সব কাজ ছেলেবেলা থেকে আমি করে দিই
সে পারে না কিছু
সে মূঢ় নিসর্গে ঘুম, ঘুমের আলস্যে মুখ নিচু
আকাশের দিকে পিঠ করে শোয়, ভঙ্গি তার ভালো
তবুও, আমায় দেখে একরাত্রে ভীষণ চমকালো।
সে, মানে মনীষা, তার নগ্ন দেহে তখন বিদ্যুৎ
অনেক চিক্কুর দেয়, আমি মেঘ, বৃষ্টি-ভেজা ভূত !

৩৯

আবার সুন্দর ! তুমি কেন আসো ভিখারির মতো···
আমাকে জ্বালাতে ? কেন কাছে আসো, দূরে যেতে চাও !
আবার সুন্দর তুমি ফিরে আসো ভিখারির মতো
আমাকে জ্বালাতে।

৪০

কী হবে জীবনে লিখে ? এই কাব্য, এই হাতছানি···
এই মনোরম মগ্ন দীঘি যার দু'দিকে চৌচির
ধমনী—নেহাতই টান, আজীবন সমস্ত কুশল
ফাঁস থেকে ছাড়া পেয়ে, এই মৃত্যুময় বেঁচে থাকা ?
কী হবে জীবনে লিখে ? এই লেখা, এই হাতছানি !
সুন্দর আমার কাছে শুয়ে আছে মানুষের মতো—
এই দেখে আমি তার পাশ থেকে দ্রুত উঠে পড়ি
এবং পালিয়ে যাই ঘর থেকে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে—
সুন্দর কীভাবে থাকে তখনো আমার কাছে থেমে !
সেও কি সুন্দর, ওই আগেকার মানুষের মতো ?

৪৩

চাঁদ চলে লুটিয়ে কাপড়
কোথাও লাগে না জল, ধুলো কিম্বা ধোঁয়া বা চোরকাঁটা

আবশ্যক শুকনো থাকে, পরিচ্ছন্ন থাকে
কেবল মেঘেরা তাকে তৃণাঞ্চলে ঢাকে
যেন তালি-তাপ্পি দেওয়া গরিবের কানি
আমি জানি
তুমিও চাঁদের মতো বহুদূর থেকে
আলুথালু কাপড়ের বশবর্তী নও
সে কাপড়ে লেগে যায় ধুলোবালি চোরকাঁটা সবই
তুমি ঠিক চাঁদ নও, চাঁদের মতন নও কিছু
ভালোবাসা থেকে তুমি বহুদূরে, বহুদূরে নিচু
সেখানে একাকী তুমি থেকো চিরদিন
এই-ই চাই।

৪৫

নদীর কোলের কাছে বালি, নদীর
ভিতরে অন্ধকার, তাতে আলোর মতো মাছ
সোনালি রুপোলি।
দুপাড়ে পাথর, পাথরের কনিষ্ঠ নুড়ি
তার রং নানারকম, সেই নুড়ি নিয়ে
চলতে চলতে নদী পড়েছে সমুদ্রে।
মানুষের ঘরে ঘরে গাছপালা, সেই
গাছপালার সমুদ্রে কাগজের নৌকো,
বৃষ্টিবাদল—তার মধ্যে গাছের মতো
সোনালি রুপোলি মানুষের শিশু
মানুষের সঙ্গে সমুদ্রে যায়…
ওদের যাওয়া দরকার।

৪৭

সকাল থেকে সন্ধে অমন ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদে!
যখন রঙিন অনেকটা লোক নির্বোধ আহ্লাদে
কিসে তোমার কষ্ট জানি, কোথায় তোমার দুঃখ

না পেলে ভাত, তাকিয়ে থাকো প্রভুর অন্তরীক্ষে।
আর কেঁদো না, আর কেঁদো না ভাতের পচাই দোবো
আবার যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দোবো।

৪৮

সবুজ ঘিরেছে তাকে, শস্য, খড়—যা কিছু সোনালি
সব দিয়ে, মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে গেছে
এইভাবে, তবু যায় মানুষেরই গন্তব্যবিহীন
আলুথালু পথরেখা ঐদিকে—এদিকেও যায়
অর্থাৎ ফিরেও আসে, মনে মনে, ধেয়ানের মতো,
গোপন নামের মতো, যেন সাপ, স্বপ্ন, দুঃখ যেন
অনভিনিবেশ যেন পথে পথে পাগলে পোড়াতে!

৫০

কে যেন ঈশ্বর, তাই মাঠে বসে আছে
বল্মীকস্তূপের মধ্যে মানুষের মনীষার চেয়ে
ঢের বেশি আলুথালু, ঢের বেশি হতাশাব্যঞ্জক
তার মূর্তি, মনে করো, সে আমার নিজস্বও নয়—
কে যেন ঈশ্বর, তাই মাঠে বসে আছে,
মাঠে ও নদীর ধারে, বাঁধের উপরে বিসর্জন···
কে যেন ঈশ্বর, তাই বাঁধে বসে আছে
বালুকার মধ্যে সে কি, বালুকার মধ্যে সে কি নয়—
কে যেন ঈশ্বর, তাই একলা বসে আছে

৫১

মৃত্যুর অমূল চাপ মৃত্যুতেই আছে
দূরে কাছে
কেবলি সুগন্ধ ওঠে নষ্ট কিছু ফলে
আমার যা কিছু স্পষ্ট তাও কেন নেয় না সকলে?
কেবলি সুগন্ধ ওঠে নষ্ট কিছু ফলে

দূরে কাছে
মৃত্যুর অমূল চাপ মৃত্যুতে আছে।

৫২

শীতল জলে জুড়োয়
হলো হাত পা এমন বুড়ো
ওরা শীতল জলে জুড়োয়
কিন্তু, নদীর কাছে নয়
ওদের নদীতে খুব ভয়
চপল নদীকে খুব ভয়!

৫৩

এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না
নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে, পাহাড় তাকে সয় না
এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
কীভাবে হয়? কেমন করে হয়?
কেমন করে ফুলের কাছে রয়
গন্ধ আর বাতাস দুইজনে
এভাবে হয়, এমনভাবে হয়।

৫৪

আমার কাছে আসতে বলো
একটু ভালোবাসতে বলো
বাহিরে নয় বাহিরে নয়
ভিতরে জলে ভাসতে বলো—
আমায় ভালোবাসতে বলো।
ভীষণ ভালোবাসতে বলো।

৫৫

নিজেকে চার টুকরো করে একটাকে যাই রেখে
ঘরের মধ্যে চারদেয়ালের যন্ত্র দিয়ে ঢেকে
তিনটে নিয়ে শহর ঘুরি, একটা হঠাৎ হারায়
নাম-না-জানা শহর-বাজার গেরস্থালির পাড়ায়
একটা ফুটো, আধেক ঝুটো—তার জীবনে ভরি
অস্থিরতার তিক্ত আগুন এবং অর্থকরী
পুড়ন্ত চাল, পাখির পালক, দেহের শীতল ছায়া
একটি ছোটো কুঠার কাঁধে পাগল রাতের হাওয়ায়।

৬০

আমার ভিতর ঘর করেছে লক্ষ জনায়—
এবং আমায় পর করেছে লক্ষ জনে
এখন আমার একটি ইচ্ছে, তার বেশী নয়
স্বস্তিতে আজ থাকতে দে না আপন মনে॥
ওখানে যে থাকে, তাকে চোখে চোখে রাখে
হারাতে দেয় না কেউ, দেয় না নির্জনে
বসে থাকতে অন্যমনে, একাকী কখনো
ওখানে যে থাকে, তাকে চোখে-চোখে রাখে

সে শুধু পালায় দূরে, ত্রস্ত ঘুরে ঘুরে
সে শুধু পালায় আর একলা বসে থাকে
ঘর থেকে দূরে গিয়ে প্রকৃত পোশাকে

সে শুধু পালায় আর একলা বসে থাকে।

৬৭

এইখানে সে আসতেছিলো
আসতে-আসতে ভাসতেছিলো
এবং বিষে ডুবন্ত শ্বাস

ভাসতে-ভাসতে নাচতেছিলো
ভীষণ ভালোবাসতেছিলো !

৭২

আমার এখন ভারি জ্বরদস্ত অসুখ—
কপালের ওপর খাড়া চুল, মাথা ভর্তি উকুন
উলুবনে রাশি রাশি রাক্ষুসে পিঁপড়ে।
বৃষ্টি দেরিতে আসবে
খুব দেরিতে আসবে
আমার এখন ভয় দেখাতে ভালো লাগে
শুধুই ভয় দেখাতে ভালো লাগে !

৭৩

তিনি আমার স্বপ্নে কিছু কথা বলেন
তিনি আমার সঙ্গে শুধুই হেঁটে চলেন
তিনি আমার সমগ্রকে ভাঙতে দড়
তিনি আমার অকস্মাৎ ও পূর্বাপর
তিনি আমার অংশবিশেষ, কোলের ছেলে—
তোমরা তাঁকে তন্মুহূর্তে ফেলে এলে !

৭৪

একটি জীবন পোড়ে, শুধুই পোড়ে
আকাশ মেঘ বৃষ্টি এবং ঝড়
ফুলছে নদী যেন তেপান্তর
চতুর্দিকে শীতল সর্বনাশে—
পেয়েছে, যাকে পায়নি কোনোদিনও
একটি জীবন পোড়ে, কেবল পোড়ে
আর যেন তার কাজ ছিল না কোনো।

৭৫

ভেঙে দেবো—সবাই যেভাবে ভাঙে, সেভাবেও নয়
পরম আদরে ভাঙবো, যত্নে ভাঙবো, নেবো কোলে তুলে—
তারপর দু'হাতে মুখ প্রতিষ্ঠিত করে দেবো টিপে
সচেতনভাবে দেখবো—কীভাবে সম্পর্ক চলে যায়—
হায় মানুষের প্রেম, গেরস্থালি, জন্মদিনগুলি !

৮২

জ্বলন্ত এক টুকরো আগুন গিলতে গিয়ে লাগছে বরফ
কঠিন, তুমি কেমন বিষে আমাকে আজ হত্যা করো ?

আজন্মকাল জ্বালার মধ্যে ঘোঁট পাকালে দিব্যি হরফ
কঠিন তুমি রসের বশের মধ্যে ভাঙলে বৃহত্তর

নীল সামাজিক বিষণ্ণতার কলস—মানেই পাত্রখানা
কঠিন তুমি আপনি পাগল, সূত্র কিন্তু আমার জানা।

৮৩

দরজা ছিলো দুটো, ছিলো বুকজোড়া তার ফুটো
তাই কখ্‌খনো নই একা
বাহির দুজনকে ভুল দেখায়

৮৪

মৃত্যুর সম্ভাব্য কাঁটা, মৃত্যুকে সরিয়ে রাখে দূরে···
তাই কানামাছি খেলা বন্ধচোখ বাল্যের নূপুরে
অতসীকুসুমশব্দ, তাই শব্দমাত্র শুনে কবি
মনে ভাবে, সঙ্গ পাবে বধূ তার নিশ্চিত লিচ্ছবি
বংশের রূপসী কেউ, মুখ ঢাকে দর্পণ গোক্ষুরে
মৃত্যুর সম্ভাব্য কাঁটা মৃত্যুকে সরিয়ে রাখে দূরে।

৮৭

সিংহাসনের উপরে চাপ মাংস থাকতো
পায়ায় চারটে ঈগলপক্ষী বেঁধে রাখতো
কোন্ সে রাজা উড়াল দিতো নীল আকাশে
উড়ন্ত সেই টুকরো নিতে ক্ষুৎপিপাসায়।

৮৮

এখান থেকে আমার
ইচ্ছে পথে নামার।
কিন্তু পথগুলো সব নদীই
রঙিন মাছটি হতাম যদি।

৮৯

মাথার ওপর আকাশ পুড়ছে
বাতাস বইছে অনেক জোরে
রোদ্দুরে ভয় করছে ভীষণ—
তাই কি আমায় রাখছো ধ'রে ?

৯২

ভুল হয়েছে ভুল
মাথার ভিতর দু'হাত, ওড়ে পেটের ভিতর চুল
কোথায় হাওয়া, চোখের চাওয়া, কোথায় বকুল ফুল ?
ভুল হয়েছেই, ভুল !
এই তো বনের ধার
কালো তিজেল, ঠাণ্ডা উনুন—বাড়ন্ত সংসার
কোথায় মানুষ, মেঘের ফানুস, কোথায় গলার হার
দূর পাহাড়ে দেখা আমার বাড়ন্ত সংসার !

৯৩

আমার কাছে একবেলা খাও, একবেলা খাও ওর কাছে
পোকায় আমার কাটলে পাতা ফুল ফোটালে ওর গাছে।

৯৪

মনে হয় সুখে আছি এই হিংস্র বনের ভিতরে
দুঃখ দাঁতে করে নিয়ে উদ্ধত হয়েছে গাছপালা
জ্বালা সব ধুয়ে গেছে সবুজ বৃষ্টিতে ঝড়ে মেঘে
আন্দোলন করে পাখি সন্ধ্যায় সকালে বায়ুবেগে।
খরগোশ ইঁদুর আছে, ছোট প্রাণ নিয়ে আছে বুঁদ
এইখানে, ঝর্ণাজলে ঝিকিমিকি মাছ করে খেলা
এইখানেই, মনে হয়, স্তব্ধ হয়ে আছে ছেলেবেলা
বড় দুঃখী মানুষের মানুষীর সুখেভরা মন॥

৯৫

বনের মধ্যে আপনমনে একটি মানুষ হাঁটতেছিলো
কাঠুরে কাঠ কাটতেছিলো
আসা-যাওয়ায় কাটতেছিলো
তার ভিতর অন্য মানুষ আপনমনে হাঁটতেছিলো
আমায় ভালোবাসতেছিলো, ভীষণ ভালোবাসতেছিলো।

৯৬

শব্দের আড়ালে কিছু শব্দ ছিলো শিকড় জড়িয়ে—
পাতারা জানতো না, তাই নিশীথে কেঁপেছে ভয়ংকর
ভয়ে ও ভাবনায়—ওই কথা বলে, কারা কথা বলে ?
হলুদ জোনাকি এসে উড়ে উড়ে পড়ে
চাঁদের প্রচ্ছায়া জলে একাকী লুকানো
প্রান্তর পাথর নিয়ে বৈশাখের ঝড়ে
—নীরবতা কোথা আছে, কান পেতে শোনো।

৯৮

প্রকৃত নক্ষত্র নাকি ছায়া ফেলে রাখে
এই হিম, অলৌকিক জলের ভিতরে
নক্ষত্রের ছায়া নাকি সোনার দরজা
নেমে যায়…
যে পাহাড় ঝুঁকে ছিল সে গেছে মিলিয়ে
আকাশে উজ্জ্বল পেঁজা মেঘের সমূহ
বনের কাপাস যেন দূরে উড়ে যায়।

১০০

বনের ভিতর থেকে ঝর্ণার অস্থির শব্দ আসে
এখানে বাতাসে
মানুষের ক্লান্তিহর কোন্ গন্ধ বনফুলে ভাসে ?
বুঝি না, বুঝি না গন্ধ কিছু
মানুষের সংঘ থেকে সরে এসে মাথা করি নিচু
বনের ভিতরে ঝর্ণা, তার কাছে যাবো
মুখটি বাড়িয়ে তার শান্তি ও কল্যাণ বুকে পাবো
আর কোনো কিছু যাচ্ঞা নেই
এই-ই সব ॥

১০২

আমায় সম্পূর্ণ করে দেবে বলে ফিরিয়ে দিয়েছো
এই ভেবে, দীর্ঘকাল কেটে গেছে, বাকিটাও যেতো।
কিন্তু, কোথা থেকে হলো, কোন্‌ভাবে হলো
—একটি অসম্পূর্ণ গাছ উঠোনের কোণে !
কী গাছ ? সামান্য কিছু—ফলের, ফুলের।
পাতা নেই, কাঁটা আছে, দীর্ঘ এলোমেলো
স্নাঙুলের মতো আছে কিছু ডালপালা।
শিকড়ে লাবণ্য আছে, জোর আছে নখে—
সব আছে, সবই ছিলো, কিছু যেন নেই !

সুন্দরের গান শুধু সুন্দরই শুনেছে
আমরা পাথর হয়ে পড়ে আছি নদীর ওপারে
ওখানের গাছপালা আমাদেরই কাছে
ওরাও শুনেছে গান, এপারের বাতাসে পাঠানো।
কাছে আনো, দূরে নিয়ে যাও
সুন্দর সর্বত্র আছে, এই কথা জানো।

১০৫

বাগানে একবার ঘুরে আসি—
কিছু বাসি ফুল পড়ে আছে
তুলে নিই।
অন্য কারো দোষ, ওর নয়
ওর ঝরে যাবার সময়
সে ছিলো না কাছে—
দোষ তারই
দেখি, যদি পারি
কালও যাবো
বাসি ফুল, তোমায় কুড়াবো।

১০৬

নক্ষত্রের কাছাকাছি মেঘ উড়ে যায়…
মাঠের উপর শুয়ে এইসব স্বর্গের কাছের
প্রসন্ন মহিমা দেখে চমৎকার লাগে
তার আগে শস্যক্ষেতে গন্ধ উঠেছিলো
সম্পূর্ণ শস্যের গন্ধ, ভাতের, ফ্যানের
যদিও স্বর্গীয় নয়, চমৎকার লাগে।

১০৭

আকাশে অনেক পাখি
ঢেকে রাখি নিজেকে চাদরে
কেন, জানো ? তোমার আদরে
একদিন
পাখি হয়ে গেছি
পালিয়েছি, ফিরেও এসেছি
এখন, প্রকৃত ভয় করে
ঢেকে রাখি নিজেকে চাদরে
যদি যাই, যদি ওরা ডাকে
ভয় হয়।

১০৯

পথে পড়ে আছে চাঁদ, তাকে নাও তুলে
সংকেতের মতো রাখো কৃষ্ণ সিঁথিমূলে
জঙ্গলের, আর নিজে পাহাড়ে দাঁড়াও—
চূড়ায়, আকাশে এসে তোমায় শুধাবে ;
এপথে নিঃশব্দে যাও, তার দেখা পাবে।
গাছ আছে, পাখি আছে, চাঁদ আছে জলে
ঐখানে ঢাকো মুখ শান্ত করতলে—
তার দেখা পাবে, যদিও চাও

জলে শুয়ে আছে চাঁদ, তাকে তুলে নাও।

১১১

ফুলের মতো সহজ হয়ে আসে
তোমার কিছু বলার মতো ভাষা
দেয়াল নেই, দরজা নেই তাতে
তোমার হাত রেখেছি দুই হাতে

করতলের পুরানো সব রেখা
নতুন করে সময় হবে দেখার ?
কী সুখ দেখে অপরূপ মুখখানি
তোমার কথা আমিও কিছু জানি ॥

শব্দের ঝর্ণায় স্নান

শব্দের ঝর্ণায় স্নান করে ওরা, আকাশের নিচে
কালো পাথরের কোলে জল ও দুধের শব্দ ঝরে পড়ে, ছিন্নভিন্ন ফেনা
কোটরে হৃদয়ে জমে, স্থিরচিত্র বিংশশতাব্দীর
তরুণ কবির রক্ত, স্মৃতি, মেধা তছনছ সংসার
বিষের মতন বদ্ধ শব্দ আসে মুক্তস্রোত থেকে
সেখানে সে-গর্তে ওঠে শরবন, ভাসে গুঁড়ো পানা
প্রতিষ্ঠান এইভাবে শিল্পের সংস্রবে সাড়া দেয়
অর্থ দেয়—টাকাসিকি, সম্বর্ধনা, তামার ফলকে
ছেনি দেগে নাম লেখে···এবং দেয় যা পচনের
আগুপিছু অর্ধসত্য

শব্দের ঝর্ণায় স্নান করে ওরা, আকাশের নিচে

এই তার বনাঞ্চল, এইখানে সুখের বসতি
সুন্দর এখানে একা নয়, আছে সমভিব্যাহারে
সম্পদে-বিপদে-সুখে কাজে অবসরে আছে আলস্যে গভীর
কখনো-সখনো একা হেমন্তের পাতার আড়ালে
কিশোরবেলার ছেঁড়া ফ্রক, তাপ্পি-মারা লাল জুতো—
এইসব সঙ্গে নিয়ে, বড়ো একা, কখনো-সখনো

শব্দের ঝর্ণায় ওরা, স্নান করে আকাশের নিচে

তার কানে শব্দ নয়, চোখে আছে বিষাক্ত ভুবন
ভালোবাসা থেকে এক কৃমিকীট উঠেছে পাথরে
এবং বিমূঢ় হয়ে চেয়ে আছে, অসহ্য সুন্দর
কীটের প্রবৃত্তি থেকে কীর্তিনাশা অগ্নি জলে দেখে
ভয় পায় দুঃখ পায়। অভিমান যেন সে শিশির
বাতাসে পাতার মতো ঝরে যায় শব্দের শিবিরে
একা একা

এইভাবে দুজনের দেখা মধ্যরাতে, শ্বাপদসংকুল বনে

শব্দের ঝর্ণায় ওরা স্নান করে আকাশের নিচে
উৎসব শুরু ও শেষ, শোলাফুল চাঁদোয়ায় হিম
চাঁদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, মনে পড়ে তারও
আর কোনো কাজ নেই—
'এবারে অন্যত্র যেতে পারো'

শিকড়ের মতো, একা

মাথার ভিতরে শান্ত অগ্নি তাকে পাগল করেছে
সে বসে রয়েছে গর্ত খুঁড়ে মগ্ন শিকড়ের মতো
শাদা দুধ উই, গুব্‌রে, সুদর্শন, গন্ধী পোকা যতো
আছে তার কাছাকাছি, কাছে নেই মানুষের পাড়া
মানুষ সকলে গেছে মন্দিরে ও মঞ্চের উপরে
কী যেন প্রার্থনা আছে, কী যেন বক্তব্য আছে তারও
পোকামাকড়ের নেই মন্দির মসজিদ প্রতিষ্ঠান
দলমত নির্বিশেষে ওরা আছে পাগলের কাছে
যে বসে রয়েছে গর্ত খুঁড়ে মগ্ন শিকড়ের মতো
একা…

মরার কথায়

একটি ছেলে কাঠের ঘোড়ায় চড়তো
অন্য ছেলে মাটির ঘোড়া গড়তো
তারা কোথায়, তারা দুজন কোথায় ?
বাঁচার কথা করেছে অন্যথা !
কাঠের ঘোড়া আঁস্তাকুড়ে পুড়ছে
ভাঙা মাটির ঘোড়া পাগল জুড়ছে
তারা কোথায়, তারা দুজন কোথায়
মরার কথায় করেনি অন্যথা ॥

সহজ

আমি একটু সহজ করে কথা বলবো ভেবেছিলাম
তুমি আমায় করলে কঠিন
আমার পথের উনিশটি দিক, সূত্রে কিন্তু একটি মুঠি—
আমি একটু সহজ করে কথা বলবো ভেবেছিলাম !
ভেবেছিলাম ঘরেই যাবো, কিন্তু ঘরে পরের বসত
আমার বুঝি ঠাঁই হলো না
উনিশটি পথ আকার টানে, উনিশ বাঁধন রাখছে বেঁধে
কণ্ঠে সকল জটিলতার ভিতর থেকে বলছি কেঁদে—
আমি একটু সহজ করে কথা বলবো ভেবেছিলাম
কথা আমার বলা হলো না।

গাছ কেন

গাছ কেন গাছের বিরুদ্ধে কথা বলে ?
কারণ জানি না, কেন পাখি উড়ে চলে
আকাশে যেমন মেঘ, সুগন্ধ ফুলের—
কারণ জানি না কেন সৌন্দর্য চুলের
কারণ জানি না কেন গাছ কথা বলে
গাছের বিরুদ্ধে, গাছ মানুষ তো নয় !

ফুলঝুরি, তোমার নাম

ছেলেবেলার ফুলঝুরি, তোমার নাম আমার এখনো মনে আছে।
বলো তো আমার মন ভালো কিনা ?
মোরগঝুঁটি ডাকবাক্সে শাদা পাতা ফেলবামাত্তর কি তুখোড় সব চিঠি—
নিচে লেখা : প্রণাম জানবেন, ভালোবাসা নেবেন।

আরে বাপু, আমি তো ওটুকুর জন্তেই ব্যাকুল !
সেই যবে থেকে চটা-ওঠা মার্বেল-গুলি জমাই,
যবে থেকে চুড়ি-লম্পর যোগাযোগে বানাই শিকলি,
অষ্টপ্রহর বুকে ছিপি এঁটে গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না ;
তবে থেকেই, ভালোবাসা, তোমার জন্তে ওৎ পেতে আছি।

জন্মভূমি—কথাটার মধ্যে এক আশ্চর্য মাদুর বিছানো আছে,
তাতেও শুয়ে দেখতে পারো।
জালাযন্ত্রণার কথা মুখ ফুটে না বললেও টের পাই—
মানুষ যেমন ফুল, মানুষ তেমনি কাঁটা !
ঘরের ভেতরকার আসবাবে হোঁচট খেলেও তো তাকে রাখো !
সুতরাং—

ভালো মনকে বুঝ্ দিতে সময় লাগার কথা নয়
ফুলঝুরি, তোমার নাম আমার এখনো মনে আছে।

একদেশে সে মানুষ

একদেশে সে মানুষ এবং অন্যদেশে পোকা
দেখতে দেখতে গাছ ভরে ফুল ফুটলো থোকায় থোকায়
কোন্ করুণায় ? কার করুণার টানে ?
এর মানে কী মানুষ শুধুই জানে !

আমার মধ্যে একবারই তার ভুলে—
আপাদমাথা উন্মাদনা দাঁড়ালো চুল খুলে,
দিন মনে নেই, ক্ষণ ছিলো কি কিছু ?
আমার মধ্যে মুখটি ক'রে নিচু
দেখতে-দেখতে বুক ভরে ফুল ফুটলো ফুল থোকায় থোকায়—
একদেশে সে মানুষ যখন অন্যদেশে পোকা ॥

ভালোবাসা

এখন শুধু ভালোবাসায় ভর করে এই রাস্তা হাঁটি
বিকেলবেলা বেড়াই উড়ে বন্দিনী কোন্ সুমুদ্দুরে
জাহাজ ভাসায় ?
এখন শুধু ভালোবাসায়
ভর করে এই রাস্তা হাঁটি
চারপাশে গাছ সহ্য করে মন বিনিময় ওষ্ঠাধরে
দাঁতকপাটি।
কিন্তু এমন হাল ছিলো না এই বসন্তকাল ছিলো না—
শূন্য শাখায়

আমার মতন আষ্ঠেপৃষ্ঠে দুঃখ ছিলো তার অদৃষ্টে
তাই খুঁজে পায়
সড়ক সৌধ কানাগলির মধ্যে নীরব বনস্থলী
এবং দুঃখ তার অদৃষ্টে
শূন্য শাখায়

কেন যাবো ?

বৃষ্টি হলে, মনে হয়, আমি ঐ বৃষ্টির জলের
সঙ্গে ঢুকে মিশে যাবো পড়ে-থাকা ভুবনে, মাটিতে—
কিন্তু কোন্‌ভাবে যাবো ? কেনই বা যাবো ?

আকাশে কেটেছে কাল, বাতাসের সাঁতারে সন্ধ্যায়
ভেসে চলে যেতে হতো পাখির মতন কোন গ্রামে
তাদের নদীর পাশে গাছের পাতার অন্তরালে
মানুষের সব কিছু ভুলে গিয়ে পাখি হওয়া যেতো—

সেই সুখ-দুঃখ ছেড়ে চলে যাবো ভুবনে, মাটিতে ?
কিন্তু, কোন্‌ভাবে যাবো ? কেনই বা যাবো ?

সন্ধ্যা হয়ে এলো

সন্ধ্যা হয়ে এলো, তবু আমাকে ভৎর্সনা
কেন করো, সন্ধ্যা হলো তবুও ভৎর্সনা !
অন্যায় করেছি, গেছি বনের ভিতরে
সেখানে চাঁদের ছায়া জলে পড়ে ছিলো
ঝর্ণায় বিম্বিত ছিলো ভূখণ্ড আকাশ
সন্ধ্যা হয়ে এলো, তবু আমাকে ভৎর্সনা

কেন করো ? যেন দিন তোমার আত্মীয়
আমার আপন নয়, কেউ নয় যেন
শত্রু যেন, বন্ধু নয়, শয্যা নয়, কাঁটা—
সন্ধ্যা হয়ে এলে করো আমাকে ভর্ৎসনা !

একটি পাথর দুটি পাথর

চতুর্দিকে গাছ এবং গাছের ছায়া, তিনটে পাগল
চেয়ার শূন্য, আমরা মাটির ওপর তলায় বসে আছি
সামনে আছে জলন্ত ছাই, চোখের জলের দেয়াললিপি।
মনে পড়ছে গাছের তলায় আমরা দুজন একাকী সে-ই,
একটি পাথর, দুটো পাথর, পাথর যাকে রাখছে কাছে
সে স্মৃতি কি আমার আছে ?
আমি যে চাই গাছের ভিতর পাতার ভিতর পড়ে থাকতে।

অন্ধকারে

অন্ধকারে হাতে আসে হাত
কে তাকে ধরেছে অকস্মাৎ
কে সে ? কথা বলো, কথা বলো।
শব্দ নেই, শব্দ নেই কোনো
শব্দ নেই, শব্দ নেই কোনো।

কবিতার তুলো ওড়ে

কবিতার তুলো ওড়ে সারারাত্রি মনের ভিতরে
হাওয়া লেগে
খেলাভোলা শিশু
এক খেলা ফেলে রেখে এ-নতুন উৎক্ষিপ্ত খেলায়
সমর্পণ করে সব—অশ্রুহাসি স্বপ্ন পরিশ্রম

কবিতার তুলো ওড়ে সারারাত্রি মনের ভিতরে
শুধু কি ওড়ে না শিশু
ছুঁয়ে থাকে মাটির বাস্তব ?
কিন্তু তা কী ক'রে হবে···
ও যে নখে বালিশ ছিঁড়েছে !

চাঁদের কাছে

অস্পষ্ট চাঁদের কাছে হাত পেতে রয়েছে ভিক্ষুক
দাঁড়িয়ে এখনো
তুমি তার পাশে গিয়ে প্রার্থী হয়ে শোনো
সে কিছু চাঁদকে দেবে ব'লে
বহুকাল থেকে রাখে দুঃখমুদ্রা জড়ানো কম্বলে !

মাথার উপর এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ

মাথার উপর এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ, চারিদিকে
কাঠের পাব্‌ড়ার পাহাড় আর শীতের কনকনে হাওয়ায়
বেলপাহাড়ির কাঠের গুদোমে বসে, চৌকিতে জবুথবু
সাপ জ্যোৎস্না ভালোবাসে ! কোঁড়কভাজা আর কাঠের পাব্‌ড়ার

খুন্তিতে মাংস ঘাঁটছে সাঁওতালি কামিন, দুটো মোরগ
জবাই হলো আজ রাতে, ভাতের ধোঁয়া উঠছে, গন্ধ
ভাসছে বাতাসে, গুলিয়ে উঠছে পেট, ভাতের গন্ধ
নাকে এলেই কেমন খিদে পায়! কলকাতার রাস্তায়
ভিখিরিরা ইঁট পেতেছে, তিজেলে সিদ্ধ হচ্ছে ভাতের সঙ্গে ছাইপাশ
আনাজ কোনাজ—বাজারকুড়নতি যা কিছু পাওয়া, হাওয়া
জোর, মহুয়ার গন্ধে সব চাপা পড়ে, ঝড় উঠবে নাকি?
যে শহরে থাকি সেখানে ঝড়ের নামগন্ধ নেই
সেই শহর ছেড়ে এতোদূরে, এই পাহাড়ি গাঁয়ে কাঠের
পাব্‌ড়ার মুক্ত জেলখানায় বসে, মাথার উপর
এ্যালুমিনিয়ম চাঁদ, এখানে ফাঁদ পাতা আছে
মানুষ এখানে এলে এখানেই থেকে যায়, এখান থেকে
তার মুক্তি পাবার উপায় নেই। সাপ জ্যোৎস্না ভালোবাসে—
বাতাসে ভাতের গন্ধ!

নামছে মেঘ

কার্নিশের গা থেকে শুঁড়ি মেরে নামছে মেঘ, খসছে পলেস্তরা, খসছে
চুণ মাটি বালি। ফুল পচে যাবার দেরি নেই আর, দেরি নেই…
মানুষের মাথা ভর্তি ছাতকুড়ো পড়ছে, দোকানে-দোকানে
তা বেচে রুপো করার জন্যে যথেষ্ট ভিড়, এই 'যথেষ্ট'
শব্দের অর্থভেদে একতলার ওপর তাসের গোলামের ঘর উঠছে
গোলামের কবিতা ভারি আশাব্যঞ্জক ভাষায় পাটে পাট
কড়া ইস্তিরি, রং মিলিয়ে রিফু, হাতে সুখতলা
সম্পাদক পা দোলাতে-দোলাতে সেই সুখতলার রং
পছন্দ করেন, বলেন, আমার উরুর পাশে কাৎ-করা লবঙ্গলতিকার
ভার, আজ থেকে তোমাদেরই ওপর, তোমরা…
কুকুরের মতন ভক্ত বা বেড়ালের মতন—
কার্নিশের গা থেকে শুঁড়ি মেরে নামছে মেঘ সেই থেকে·

নলে বরফ ফাটাচ্ছে লোহা, কলকত্তা সুন্দর হয়ে দাঁড়াচ্ছে নতুন নতুন
ভিখিরির পাশে।

বেলা চলে যাচ্ছে, শুঁড়িখানার দরজায় দাঁড়িয়ে থলকমলা চীনে মেয়েছেলে
হাতে রেশন-ব্যাগ, ব্যাগ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে মুখপোড়া
খালি বোতলের ঝাঁক, ঝাঁপি-ঢাকা বগেরির ঠোঁট যেন, তীক্ষ্ণ
কলার শাঁস ঠাসচাপা খোসা থেকে কেলিয়ে বেরুচ্ছে
যেন আটা মাখছে কেউ কানাওঠা ভরনের থালে, মানুষ
ডালহৌসির মুষ্টি থেকে আঙুলের ফাঁকে পড়ছে ছড়িয়ে
বেলা বাড়ছে, ফুটপাতে কাঠকয়লার নরম আঁচ পড়ছে
পুটপুট করছে নবীন ভুট্টা, খোসায় মুখ ঘষছে বেওয়ারিশ ষাঁড়
কেমন আছো ? ভালো ? মন্দ কী ! থাকলেই থাকা যায়।
চীনেবাদামের খোকার মধ্যে এককালের কবিত্ব ছিলো—
আজ নেই, আজ খোসা পেলে খোসা চিবোয়
ময়দানে অমলাদেবীর প্রচ্ছদের ছবি, ঘাসের শিস দাঁতে কাটে
মুনিয়া, আহা মুনিয়া, ঘাসবীজে পেটভরাচ্ছে দুর্দিনে
এ দুর্দিনে শহর চিনি খাচ্ছে কাঁচগুঁড়ো আর বালি মিশিয়ে
কড়া মাঞ্জা ধরছে সুতোয়, ঘুড়ি কাটবে
কাটুক, লটকে নিতে অনেক আকাশে ভাসন্ত
একটু কায়িক খাবে একটু গোঁত্তা মারবে, তাহলেই কাম ফতে
এতোখানি বয়েসেও গা ঘামলো না, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে
চলছে দিন, ডানেরটা বাঁয়ে আসছে, বাঁয়েরটা ডানে
কোনো মানে নেই, বাঁচামরা দুটোই এক একত্র
আর কিছুদিন থাকলেই ভালোবাসা যেতো
খুব একটা কঠিন কাজ কিছু না, সন্তান হতো
আর একটুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলেই হেস্তনেস্ত হয়ে যেতো
একটা

তারপর টলোমেলো ক'টা দিন···
রাত্তিরে লোকটা আর দিনদুপুরে তার ঐ স্যাংটো পুত্তুর

দুজনে দুটো সাঁকোর ওপর দিয়ে হাঁটছে হাঁটছে ক্রমাগতই হাঁটছে
এভাবে, হাঁটতে-হাঁটতে হাঁটতে-হাঁটতে তার সঙ্গে দেখা
অন্ধকারে ঢুকতেও যে পয়সা নেয় ! হাত বাড়িয়ে বলে—
ব্যবস্থাপত্তর ভালোই, চটপট ঢুকে পড়ো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত
ঢাকতে একটামাত্র চাদর থাকলেই যথেষ্ট ॥

তোমার-আমার মধ্যে ছিলো নীল হ্যারিকেন

এ-ঘর তখন ছোট্ট ছিলো, অনেকটা ঠিক তোমার মতন
মলিন ছেঁড়া জামার মতন, দু-একটি পা নামার মতন
ছোট্ট ছিলো, এখন অনেক বদলে গেছে
কাঁঠালকাঠের চৌকি বদলে হয়েছে খাট
কুঁড়েঘরের দরজা সরে জোড়া কপাট
এখন অনেক বড়ো হয়েছে, এ-ঘর এখন বড়ো হয়েছে
এখন অনেক বুড়ো হয়েছে, অনেকটা ঠিক তোমার মতন।

তোমার-আমার মধ্যে ছিলো নীল হ্যারিকেন
বিজলি এখন পোড়াচ্ছে ঘর
তোমার-আমার মধ্যে ছিলো অগ্নিসাক্ষী ভয়ের পাথর
এখন পাথর গুঁড়িয়ে গিয়ে করছে মাটি
তোমার খেলা বলতে ছিলো চু-কপাটি
এখন খেলা বদলে গেছে, খেলা একার
তোমার-আমার ছোট্ট সে-ঘর আজকে দেখার
সময় পেলাম, ছোট্ট সময় ॥

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল

মুখে বললে না কিছু, তবু তাকে কঠিন অসুখে
দেখলাম শুয়ে আছে তোমারই বুকের মধ্যে জানলা খুলে
ভারি পর্দা টেনে, অকৃত্রিম শুয়ে আছে, যেন ঘাসে, শীতের রোদ্দুর
পোহায় হেস্টিংস, যেন নীল খাম, ভিতরে সোনালি
চুলের মতন তীব্র শারীরিক, তবু প্রকাশিত
করোনি, লুকিয়েছিলে কিংবা তাকে বলেছো শত্রু নেই…
প্রকৃত এখানে বোবার কোনো কিংবা দেরি আছে
সে ফেরে অনেক রাত্রে, চোখ ঢেকে চশমার কালোয়—
কেন ? তা কি সেইই জানে ? ঐ তার বিষণ্ণ প্রকৃতি !

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল, যাকে বলে মায়া
যেন কাঁথা নকশাভরা নক্ষত্রের গোপন সম্পদে
ঈর্ষা ক'রে, ভাঙি শব্দ…আর করি অকর্তব্য কাজ
বুঝতে পারি না কেন আজই বলি বিষাক্ত ঘটনা
এবং যে শুয়ে থাকে বিছ্না জুড়ে সে দেখায়, যাও
চলে যাও, এই শয্যা যখন আমার অধিকৃত
ক্লান্তি, ওগো রাজেশ্বরী, ওদের অক্ষম পাখ্সাট
আমাকে না শুনতে হয়, প্রেমে গদ্গদ ভবিষ্যৎ
কান ফুটো করে যদি সেই ভয়ে পাথরের কাছে—
কথা আছে সাড়া দাও…এই বলে পাথর হয়েছি
অত্যন্ত আপন।

এখন তোমার চেয়ে ঢের দূরে শব্দের ভিতরে
প্রাণপণ রঙ ঢালি যেন জল নবীন চারায়
বাঁচাতে তো হবে তাকে ? মহান জীবনে টানতে হবে।
সুতরাং দূরে গিয়ে পাথরের শব্দের ভিতরে
প্রাণপণ রঙ ঢালি, প্রাণপণ—আতিশয্য নয়॥

আমার অনুপস্থিতির সুযোগে

আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কলকাতা এক একবার ধ্বংস হয়ে যায়
যেদিকে তাকাই, দেখি—বুকভাঙা বাড়িঘর, দেয়াল টপকে পথ চতুর্দিকেই ছুটছে
আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কলকাতা এক একবার ধ্বংস হয়ে যায়
আকাশ ভেঙে পড়ে কলকাতার মাথার ওপর, মনুমেণ্ট তছনছ, আধমরা গঙ্গা
যেদিকে তাকাই, দেখি—কলকাতা নিজের ওপর যথেষ্ট প্রতিশোধ নিয়েছে
সুন্দর যখন নিজেকে ভাঙতে চায়, তখন বুঝি এমন করেই ভাঙে।

তোমাকে সময় দিয়ে আসা, তোমাকে ছেড়ে-আসা নয়—এই কথাটা
এতদিনেও কেন বুঝতে শিখলে না ?
তোমাকে সময় দিয়ে আসা, তোমাকে ছেড়ে-আসা নয় !
বয়স তো অনেক হলো, এখনই নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার
এর পর হবে ব্যস্তসমস্ত, রাজবাড়িতে ঘণ্টা উঠবে বেজে
দরজার কাছে গাড়ি এসে দাঁড়াবে—
তখন হাতের মুঠোয় শুধু যাবার সময়—শুধুই যাবার সময় !
তোমাকে সময় দিয়ে আসা, তোমাকে ছেড়ে-আসা নয়—এই কথাটা
এতদিনেও কেন বুঝতে শিখলে না ?

কলকাতার সেই ধ্বংসমাখা বুকে মুখ গুঁজে এক সময় অনেক কেঁদেছি আমি
যেমনভাবে মেঘ-বৃষ্টি কাঁদে তেমনভাবে অনেক কেঁদেছি আমি
যার কাছে এখন আলো আর অন্ধকার এক
তার সেই নানারকমের ছায়া নেই এখন আর
উঁচু-নিচু তেমন নেই গাড়িবারান্দা, অটোমোবিল সংবাদপত্র
বদলি স্টেশনমাস্টারের মতন পুরোনো জায়গা ভেঙে
আজ সে কোথায় যেন নতুন স্টেশনে চলে গেছে—

আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কলকাতা এক একবার এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যায় !

যে-পথে যাবার

যদি সারাদিন তাঁকে কাছে পাওয়া যেতো

শুনেছি ছিলেন তিনি গাছের বাকলে গা এলিয়ে
যতটুকু ছায়া তাঁর প্রয়োজন, ছিলো ততোটুকু
দক্ষিণ হাওয়ায় উড়ে শুকনো পাতা আসে তাঁর কাছে
যেন নিবেদন, যেন মন্ত্র ভাষা ছিন্নভিন্ন মালা
তাঁর জন্য ঐ দূর মাঠের রোদ্দুরও ছিলো জ্বালা
কিছুটা রোদ্দুরে হেঁটে, খালি পায়ে পড়েছেন শুয়ে—
নিদ্রা নয়, ধ্যান নয়, বেদনার ব্যথার ভিতরে
মনোকষ্ট বুকে নিয়ে শুয়ে রয়েছেন একা একা।

যদি সারাদিন তাঁকে কাছে পাওয়া যেতো

কাছে পেতে গেলে কাছে যেতে হয়, এভাবে চলে না
হাতের সমস্ত সেরে, ধুয়ে-মুছে সংসার, সমাধি—
গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে, সাধে ঢেকে—তবে যদি যাও
দেখবে, দাঁড়িয়ে আছে গাছ একা দৃষ্টি ক'রে নিচু

যেতেও হয়নি তাঁকে, তিনি এসেছিলেন সময়ে
গেছেন সময়ে চলে, সেই পথে, যে-পথে যাবার ॥

ভাষার বাঁধনে

আমি যেন ঘট, যাতে জল ধরা থাকে।
প্রকৃত শব্দের জল স্বপ্নে ও স্বাচ্ছন্দ্যে মিশে গিয়ে
কখনো ফোঁটায় পড়ে কখনো বা শ্রাবণধারায়
একভাবে

সে নাকি কবিতা, যার ভ্রূমধ্যে প্রচ্ছন্ন লাল টিপ
সিন্দুরের। অগ্নি নাকি? কাঁচপোকা সংলগ্ন আঠায়?
সে নাকি সকল রূপ ঈশ্বরের, কিশোর, নারীর—
সে নাকি সমস্তক্ষণই একভাবে ভ্রূমধ্যে থেকেছে।

এখন যাবার কথা ধুয়ে মুছে ঘটে, অশ্রুজলে—
আমারও যাবার কথা। কোথা যাবো? কোথা গিয়ে আর
শীতল মাটির মধ্যে সংস্থাপিত করবো নিজেকে
কোথা যাবো? জল পড়ে…
ভাষার বাঁধনে বেঁধে আছি।

ঋত্বিক, তোমার জন্য

এখন নিশ্চিন্ত, মৃত আর ভয় দেখাতে আসবে না
সুদূরের পথে ফেলে দীর্ঘ ছায়া দাঁড়াবে না দ্বারে
ভিতরে ভাঙবে না অস্থি, ঘরবাড়ি—সন্ন্যাসী-সংসার
কিছুই করবে না যাতে মানুষের পাপস্পর্শ আছে
আছে আছে বলে তুমি, যেখানে যা নেই, দিতে গেছো
পূর্ণতা পাঁঠার আর শূন্য খাঁ-খাঁ তোমারই, সন্ন্যাসী
যা ছিলো, যখন ছিলো তীব্র হয়ে ছিলো তা পাথরে
রূপ ও হৃদয় রক্ত স্বেচ্ছাচার উন্মাদ প্রাণের
ভরসা ও ভয় ছিলো পাশাপাশি—নিশ্চিন্ত এখন
উপদ্রুত বাংলাদেশ, আর কেউ নেই যে কড়কাবে
বিদ্যুচ্চাবুকে এই মধ্যবিত্তি, সম্পদ, সন্তোষ
মানুষের। তুমি গেছো, স্পর্ধা গেছে, বিনয় এসেছে
পোড়া পাথরের মতো পড়ে আছো বাংলাদেশে, পাশে
ঋত্বিক, তোমার জন্যে তুচ্ছ কবি আর্তনাদ করে॥

হারিয়ে গেছে

পিঠের কাছে প্রৌঢ় মানুষ বলেন ঝুঁকে
কোথায় তুমি
আদ্যিকালের শীতলপাটির ওপর-শোয়া জন্মভূমির
আদিখ্যেতার রাখাল বালক, এই বিদেশে কোথায়
তুমি ?
কেশে আমার পাক ধরেছে, হারিয়ে গেছে
জন্মভূমি !

করো—অমলের জন্যে যা করেছো

যা কিছু প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট তারই সঙ্গে কেটেছে আমার
ছেলেবেলা, দীর্ঘকাল—তুমি ছিলে দুঃখের দোসর
সুখ ! কিংবা তার চেয়ে ঢের বড়ো শান্তিনিকেতনে···

গ্রামান্তে পাঁচিলে-ঘেরা বন্দীনিবাসের থেকে রোজ
তোমাকে বলতাম : করো—অমলের জন্যে যা করেছো

কিন্তু চিঠি দিতে না প্রত্যহ, কানে কানে
হাতে-ধরা টেলিপোস্ট বার্তা দিয়ে জানাতো বিদায়···
একদিন
টকির ঘনান্ধ পর্দা রীতিমত মৃত্যুতে সাজালে।

সেই থেকে,
ভেবেছি যা প্রাপণীয়, তা তোমার উন্মুক্ত বন্ধন
রচনার, আষ্টেপৃষ্ঠে সে বন্দীত্ব নিজ হাতে গড়া ॥

বস্তুর গ্রন্থনা থেকে এইভাবে

বস্তুর গ্রন্থনা থেকে বস্তুকেই মুক্তি পেতে হবে
মুক্তি তো দেবার নয়, নিতে হবে প্রত্যক্ষে ছিনিয়ে
অথবা গোপনে কোনো চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্য তার
অবিসংবাদী প্রেম, উপঢৌকনের মতো মেঘ
যারা ভেসে আসে কোনো খোলা মাঠে, অব্যর্থ হাওয়ায়
বস্তুর গ্রন্থনা থেকে বস্তুকেই মুক্তি পেতে হবে
—একদিন।
তা না হলে সবই ব্যর্থ—উদ্যোগ, উদ্যম, অভ্যর্থনা
জীবনধারণ ব্যর্থ, ব্যর্থ সব কৃত্রিম প্রকৃতি
কায়ক্লেশ, দুঃখ-সুখ, মনে পড়া স্বপ্নে ঘুমঘোরে
বালকের দোলমঞ্চ, ভাঁটফুল, মর্নিং-ইস্কুল
ব্যর্থ ক্ষয়রোগ আর রক্তের ভিতরে তার খেলা—
অমরতা নাম্নী ঐ নারীটির ভ্রূমধ্যে আমার
চুম্বন দেবার কথা—দেবো না, দেবো না কোনোদিনও
—এইভাবে
বস্তুর গ্রন্থনা থেকে বস্তুকেই মুক্তি পেতে হবে॥

অমল প্রাসাদের জন্য

অসংখ্য শবের প্রাণ আমি নিজে প্রতিষ্ঠা করেছি
যেমন প্রতিষ্ঠা করে মানুষের মেধার মন্দির
মিস্ত্রি এসে, হাতে তার থাকে দীর্ঘতম এক ইঁট
অন্তহাতে কর্নিকের ধারালো ও সংযত হিংসার
প্রতিচ্ছবি, মনে মনে মহালের বিশুদ্ধ প্রতিমা—
এইভাবে শব্দ নিয়ে আমি এক প্রাসাদ গড়েছি।
সে প্রাসাদে আছে কেউ? শরীরের মতন মহান
নিয়ে কেউ আছে নাকি? থাকা যায়? জানি কেউ পারে

কেউ কেউ পারে জানি, কেউ কেউ ওপারে বসেই
এপারের সুস্থতার সুতো নিয়ে নুড়িও ওড়ায়
অন্তান্ত গার্হস্থ্য করে, খেলাধুলো প্রাকৃতিক কাজ
সবই করে বিধিমতো—আমি নই ততো শারীরিক
তবুও আমাকে তৈরি করতে হয় অমল প্রাসাদ
নিজে থাকবো বলে নয়, মনে হয়, তোমরা বাস্তু পাবে।

সমুদ্রের পারে

সমুদ্রের পারে এসে বসে আছে অজানা কিশোর,
তুমি তার নাম জানো? জানি আমি। সে শুধু আমায়
নিজস্বে বসায়। তার ধ্যান জানে, জানে না সংবাদ,
জানে না সংবাদপত্র, কার নাম? সে শুধু একাকী—
একাকী গাছের মতো। সংবাদপত্রের মতো যেন
সে শুধু একাকী থাকে, একাকী এ-কলরব করে,
সে শুধু একাকী থাকে, অবিরাম কলরব করে।

রূপবান

শব্দের যেখানে ফাঁক, সেখানে রঙের বাটি ঢেলে
এখনি উপুড় করে দিতে পারি, দিয়ে দেখি ঠিকই
ভাষার দেয়ালে-দোরে লেগে গেছে সমস্ত নির্ভীক
রক্ত, হিম, তন্তুজাল। শব্দের এমনই ফাঁক আছে।

শব্দের এমন ফাঁকে জলজঙ্গলের কিছু গাছ
রয়ে গেছে—গাছ গুল্মলতাপাতা হরিদ্রাভ ফুল
অরণ্যের কিছু গাছে ফুটে আছে অসহ্য শিমুল
আছে আছে শব্দ আছে প্রাসাদ-জানালা হয়ে দূরে

কৃত্রিম শব্দের বনে বাজে কার বিষণ্ণ নূপুরে
গান, ধ্বনি, বর্ণময়, রূপবান স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

পলিমাটি নখে ছিঁড়ে

মাছ ধরবো বলে এই সমুদ্রের তীরে
আঁশগন্ধ, মানুষের বাল্যকাল, ছেঁড়া কাঁথাকানি
চুপড়ি ঝোড়া সব আছে, তন্তুজাল নেই
শুধু-হাতে ধরবো বলে, মাছ, এই সাগরের তীরে পর্বতপ্রমাণ হয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছে
মাছ কি পর্বত ?
পর্বতের মাছ আমি প্রস্তুত দেখেছি ঝর্নাজলে—খেলা করে একা একা
হলুদ সবুজ খেলা মাছেদের, পর্বত-মাছের, আকাশের খুব কাছে,
মশারির তালি-তাপ্পি চালে
ছারপোকা যেমন চাক ভেঙে রাত্রে খেলে একা একা
পরিপূর্ণ হলে মাছ, তেমন তাদেরো যায় দেখা, আগে নয়,
বাল্যে নয়—মায়ের সংসারে।

আমাদের কাজ মাটি ধুতে আসা মাছের মতন, ধুলোঝুলকালি ঝেড়ে
ঝেড়ে ফেলে ক্লান্তি ব্যবহারে, ভাঙা শব্দ, ছন্ন রঙ, দাবিদাওয়া,
অধিকারবোধ

এ সমস্ত ফেলে পরা শাদা শুভ্র কাপড় একখানি, মাথায় উষ্ণীষ যেন
নিচু অঙ্গে কিছুই না থাক, জলে ঢাকা আছে।
গাছেরও তো কিছু নেই ; ডালপালা আছে, ফুল আছে,
ফল আছে, সংশ্রব রয়েছে
মানুষের সঙ্গে ঘোর, সবাই কাঠুরে নয় বলে
গাছের অঙ্গুলি ধরে সাপটে কালো মাটি
খাঁটি, সব খাঁটি, এই ধোঁয়া, জলকাদা—মাছধরা

না-ধরা সকলই
খাঁটি, শুধু পলিমাটি নখে ছিঁড়ে মাছ ধরে ওরা
ওরাও একদিন নিজে ধরা দেবে, ধরা দিতে হবে ॥

পাতাল থেকে ডাকছি

পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ?
পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছো ?
এখন এসো, তোমার অমন আকাশ থেকে মাটির নিচে

এসে দাঁড়াও, আমার কাছে, আমার আঁচে পোড়াও দু পা
দু হাত পোড়াও, নরম ননীর মতন শরীর পুড়িয়ে কালো
কলুষ করো, আমায় ধরো···পাতাল বড়ো কষ্ট দিচ্ছে

চূড়ার থেকে শিকড় ধরে নামো আমার মুখের উপর
বুকের উপর, সুখের উপর, দুঃখভরা নখের উপর
যেন মাটির উপর থেকে আঁচড়ে মাটি নখ নিয়েছে

পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ?
পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছো ?
এখন এসো, তোমার একার আকাশ থেকে মাটির নিচে

এসে দাঁড়াও, আমার কাছে, পাতাল বড়ো কষ্ট দিচ্ছে
আমার কাছে লুকিয়ে আছে তোমার জন্যে ভালোবাসা ॥

বাদামের পাতা তুমি

পাতা ঝরে, পাথরের বুকের উপরে
ঝরে পাতা, ছেঁড়া কাঁথা আরো যায় ছিঁড়ে
ভাসন্ত বাহির থেকে ভিতরে নিবিড়ে
শীত ও হেমন্ত শুতে আসে পাশাপাশি।

বাদামের পাতা ঝরে পাথরের বুকে
ঝরে পাতা বুড়ো পাতা উন্মুখ মাটিতে
পাখির পালক ঝরে মাদুর-পাটিতে
তুলো যেন বালিশের, থাকে কাছাকাছি।

মানুষ তেমনি ঝরে অট্টালিকা থেকে
পথের উপরে, খাট ঢেকে যায় ফুলে
গন্ধ যেন ঘূর্ণি, যেন জলস্তম্ভ ওঠে
প্রাসাদ দেয়াল পরস্পর মাথা কোটে
অবহেলে কেন গেলে ? কেন চলে গেলে ?
বাদামের পাতা তুমি ? বুড়ো পাতা তুমি ?

তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না

তোমার কাছে যাবার ইচ্ছা আমার হয়েছিলো খুবই
কিন্তু এই নিরুদ্ধার উপত্যকা থেকে বুঝি কেবল টেলিগ্রাফ-তার
বেরিয়ে যাচ্ছে রামগড়ের দিকে
আর কিছু যায় না—সকলি আসে
তোমার কাছে যাবার ইচ্ছা আমার হয়েছিলো খুবই
এখানে সকলে আমরা তাঁর সেকালের মুখের শ্রী
অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম
তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না, তুমি জানো।

তুমি তোমাদের সেই হলুদ বাগানে জল দিচ্ছো এখন
এখন তোমার পায়ের পাতায় পড়েছে কাদা জলের ছিটে
তোমার শাড়ির পাড় ভিজে গেছে ধুলার জলে
গুনগুনিয়ে ফিরছো—এ পরবাসে রবে কে, কে রবে সংশয়ে—
এখন তোমার মুখের উপর এসে পড়েছে তালতমালের আলো
তোমার মুখের পুবপশ্চিম কিছুই দেখা যায় না এখন
তোমার মুখের উপর আমার মুখের নির্বাসন ঘটেছিলো খুবই
এখন এখানে আমরা তাঁর সেকালের মুখের শ্রী
অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম
তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না, তুমি জানো ॥

মিশে গেছি শব্দের সহিত

শব্দের নিজস্ব কিছু ক্ষিদে আছে, ক্ষুন্নিবৃত্তি আছে ;
যা নেই, তা হলো এই পরিপাক করার ক্ষমতা।
শব্দ যেন হাওয়া খায়, ভাত খায়, মাছমাংস খায়
যেহেতু খায় না জল—সেহেতু ধরে না কোনো পচ্
স্তূপকরা অম্লে-শস্তে, শব্দের বিষণ্ণ গন্ধ আছে।
তবুও কয়েকটি শব্দ হাসিখুশি, স্তব্ধ কোনোটি বা
যুগলে মানায় কাউকে, অন্যে বসে নিভৃতে, বিরহে—
এইসব সহজাত শব্দেরা কখনো করে খেলা
মানুষের শিশুদের মতো মাঠে, সমুদ্রের তীরে
বালু নিয়ে অকারণ, বল নিয়ে, ইয়ো-ইয়ো নিয়ে—
সেই স্বাভাবিক খেলা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি
একদিন, তারপর মিশে গেছি তাদের সহিত
আমিও অব্যর্থ শব্দ, আমাকে খেলায় নিতে হবে
এই বলে ; ব্যবধান না রেখে অন্দরে চলে গেছি ॥

মৃত্যুর বিষয়ে

হত্যা করে আমাকে পাথরে
অথচ কোলের কাছে ঝর্না ছিলো, মায়াকাননের
ফুল ছিলো ফুটে, ছিলো করপুটে পাগল শিকড়
যা ধ'রে এ-দেহ-প্রাণ আবার বাতাস নিয়ে সংসার সাজাবে
ভেবেছিলো এই হাসি, শিশুমুখ, ফুল ফুটে-ওঠা
আরো কিছুকাল ধরে দেখে যাবে, ভেবেছিলো এই
সুন্দর সহাস্য সব মানুষের ভালোবাসা পেয়ে, সুখী হবে—
ভেবেছিলো শুধু এই নরম মাটির মধ্যে হাত গুঁজে প্রার্থনা জানাবে

কে জানাবে ? এই আমি, যে পাথরে শুয়ে
মৃত্যুর বিষয়ে কিছু কথা বলে যাবে।

ও গাছ, আমাকে নাও

গাছের ভিতরে যদি যেতে পারি একবার জীবনে
নিজেকে লুকিয়ে রাখতে, মুহূর্তের জন্যে হলে রাজি।
একটি মুহূর্ত আমি একা চাই, জল নয় কাঠ ও পাথরে
প্রতিশ্রুতিহীন কাঠ আমাকে নিজের করে নেবে।
বহুদিন থেকে এই সামান্য বাসনা নিয়ে আমি
জঙ্গলে গিয়েছি রাতে, অন্ধকারে। হারিয়ে গিয়েছি
কোনো শিকড়ের হাত ধরে যেতে চেয়েছি ভিতরে
—পথ আছে, পথিক একজন।

ও গাছ আমাকে নাও, মুহূর্তের জন্যে হলে নাও
তোমার ভিতরে আমি ধীর বেড়ে-ওঠা দেখে আসি।
পাথরের মতো স্তব্ধ তুমি নও, সম্প্রীতি রয়েছে
রস আছে, স্নেহ আছে, ভালোবাসা, বিবেচনা আছে,

ও গাছ আমাকে নাও, মুহূর্তের জন্যে হলে নাও।

মানুষ যেভাবে কাঁদে

মানুষ যেভাবে কাঁদে, তেমনি কি কাঁদে পশুপাখি ?
একা থাকি বড়ো একা থাকি।
ভিতরে ভিতরে একা, অরণ্যের মধ্যিখানে একা
ঘরে ও বাহিরে একা, দিনে-রাতে, দুঃখে ও সুখে
ছায়া নেই, মায়া নেই, ফুলের বাগানে নেই ফুল
ঝর্নার মতন ঢাল—পিঠ জুড়ে আছে এলোচুল
মেঘের সম্ভার আছে, জল নেই, জলজ উৎসব—
ধান নেই, টান নেই—আছে খড় শুষ্ক সন্নিপাতী
পাতার, গাছের নিচে পদতলে ভাঙনের মতো
এইসব শূন্য আছে এই দেশ পরিপূর্ণ করে।

তবুও মানুষ বাঁচে, মৃত্যু আছে বলে বেঁচে থাকে
মৃত্যু তো জীবন নয়, ধারাবাহিকতা নয় কোনো।
ভিড়ে বাঁচে, একা বাঁচে, মানুষের সমভিব্যাহারে
বাঁচে, বেঁচে থাকে—এই বাঁচতে হবে বলে থাকে বেঁচে—
মানুষ যেভাবে কাঁদে, তেমনি কি কাঁদে পশুপাখি ?
একা থাকি, তবু একা থাকি !

এই দুর্গে কিছু লোক

ফণীশ্বরনাথ রেণু শতজীবেষু

পুরনো এ-দুর্গ। ব্যর্থ জীবন্মৃত কিছু লোক এখানে নিয়েছে ঠাঁই
অনিচ্ছায় নয়। এই আলো হাওয়া রোদ ছেড়ে, মানুষী সোহাগ ছেড়ে
কিছু ক্লান্ত লোক এই দুর্গে, অন্ধকারে এসে চামচিকে পেঁচার সঙ্গে
আস্তানা নিয়েছে, ইচ্ছায় ঢুকেছে এই দুর্গে, শুধু পরিত্রাণ পাবে ব'লে
ছুরি কাঁটা প্লেট দেখে ভয় পেয়ে কিছু লোক এই দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে
রক্তে ও নিরক্তে শিশু যদি কেটে খেতে হয়—এই ভয়ে কিছু লোক এই দুর্গে

দূর কাছ থেকে কেউ, বুকে হেঁটে, আছাড়-পিছাড় খেতে খেতে কেউ
গড়াতে-গড়াতে, ভেসে, পাগলের মতো হেসে, কেউ কেউ
উড়ে এসে জায়গা জুড়ে বসেছে এখানে। না, কোনো দোকানি নয়
খবর বিক্রি করে, তাদের না-কেউ, ট্যাক্স ফাঁকি দিতে নয়, কোনো
বড়ো ভয় থেকে শুধুমাত্র বেঁচে থাকবে বলে কিছু লোক এই দুর্গে
এসে, নিতান্ত বাঁচার জন্যে বাঁচার তাগিদ নিয়ে পালিয়ে এসেছে
এদের কারুর কোনো নাম নেই, কেউ শুধু ঘাস, কেউ ইট, কেউ পাথর
চটিজুতো কেউ, কেউ বাসস্টপ, ছাতা লাঠি—এমন নির্দোষ নির্হিংস নাম
নিয়ে এরা সবাই পাঁঠার মাংস ভাগিয়ে নেয়ার মতো কুড়িয়ে নিয়েছে
সুখে আছে দুঃখে আছে—এ নিয়ে দুর্গের বাইরে কথা বলে যুবকযুবতী
বুকভাঙা গান আছে—ছবির সুড়ঙ্গ আছে, অশ্রুপাত আছে—সবই দুর্গের বাহিরে
নদীতীরে খেলা আছে, জ্যোৎস্নার ফাঁদ পাতা আছে
রঙ্গময় পৃথিবীর সব আছে, কাগুজে বিপ্লব আছে, সম্বর্ধনা আছে
গুণিজন মন্ত্রীদের, ত্রাণ আছে, বান আছে, চোগাচাপকান আছে ফটোর পুরুষে
যেখানে যা নেই শুধু সেই কথা জেনে ফেলেছিলো বলে এই দুর্গে কিছু লোক,
মানুষের মতো দেখতে, কিছু লোক, মানুষের মতো দেখতে নয়, যারা
তাদের এড়াতে, শোভাযাত্রা করে নয়, যে যার ইচ্ছায়, ভেসে
পাগলের মতো হেসে, কেউ কেউ গড়াতে-গড়াতে……

নীলকণ্ঠ তুমি, তুমি অভিমন্যু

বিজন ভট্টাচার্য চিরঞ্জীবেষু

অস্তিত্বের বড়ো কাছে, হে প্রিয়, তোমার আক্রমণ!
বজরঙ্গভূমি রক্তে ভেসে গেছে সেদিন, একদা—
তুমি তরবারি নিয়ে নেমেছিলে সন্ধ্যায় প্রভাতে।
ঐ দীপ্তি, ঐ ক্ষোভ, ঐ মারাত্মক বিবেচনা
নিয়ে, প্রিয় সশরীর নবান্নের বিষণ্ণ প্রাঙ্গণে
নেমে এসেছিলে, সেই দৃপ্ত এক কিশোর দেখেছে।

তারপর থেকে দীর্ঘ পথ ছিলো পর্যটনময়
পথ ছিলো, মত ছিলো, ফুল ও পাথর ছিলো কত।
মায়ের মমতা দিয়ে সবকিছু জড়িয়েছো বুকে
তুমি দীর্ঘতম বৃক্ষ, নাকি তুমি মাধবীর লতা—
বাংলার সন্ন্যাসে, গৃহে প্রাণময় জ্যোৎস্নায় জড়ানো ?
নীলকণ্ঠ তুমি, অভিমন্যু ব্যূহের ভিতরে
দিগ্বিজয়ী, ঢুকে গেছো, কিছুতেই বেরুতে পারছো না—
এই ভালো, কাজ নেই, জীবনে ও নাট্যে মৃত্যু আছে।

দাঁড়াও

মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে পড়ছে
সন্ধে হলে মনে পড়ছে, রাতের বেলা মনে পড়ছে
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

এসে দাঁড়াও ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

এইটুকু তো জীবন

চলো যাই, রোদ্দুর পা উঠিয়েছে, এখানে
লাঙলের ফালে উঠছে মাটি, এখানে
তেমন পরিপাটি মানুষ নেই কেউ, আদুল

গায়ে লোক চলছে-ফিরছে, আলো
বাতাসের মতো সহজ, স্বাভাবিক ; বিষণ্ণ
কবির পাশে জোলা, শহরের মতো
জল ঘোলা করতেও নেই কেউ, মানুষ
সহজে ভালোবাসে, হাসে-কাঁদে কষ্ট পায়
কষ্ট পেতে-পেতে পাথর হয় না, পাথরের
সঙ্গে কথা বলে এখানে অনেকে গাছপালার
সঙ্গে, শিকড়-বাকড়ের সঙ্গে, ফুলের চেয়ে
শিকড়ের সঙ্গেই এখানে সমঝোতা বেশি
মাটির কাছাকাছি থাকে বলেই গায়ে এদের
কেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ—ঘা কেবলি মনে পড়ায়
ভাঁটফুল, যজ্ঞডুমুর, দোলমঞ্চ আর দেবদারুর ফল
গরুর গাড়ির আলস্য আর মন্থর এখানে মানুষকে
খুব দৌড়ুতে দেয় না, বারণ করে, কেননা, এইটুকু তো
জীবন, অতো দৌড়ঝাঁপে আলাদা কী পাবে ?
জীবন ছাড়া, মৃত্যুকে পাবার জন্যে তাড়াহুড়োর কোনো
অর্থ হয় না ॥

পোড়াতে পারে না

সেই কাগজের নৌকো, রাঙা জল, উঠোনের পাশে
দোপাটির ফুল ভাসে, পাতা ভাসে আর্মাডা যুদ্ধের
ছবির মতন ঝাপসা
গড়িয়ে গিয়েছে দিন পাহাড়ের দিকে
হামাগুড়ি দিয়ে গেছে পাহাড়ের দিকে।

বনের শিকড় তাকে বেঁধে রেখেছিলো
রেখেছিলো মাটি কিছু, তামাম্বন, শালের জঙ্গলে
শেফালি শ্যাওলা কিছু, পাথরের প্রতিষ্ঠাও কিছু,
উইঢিবি, সরুপথ, ভাঙা ইট, রাঙা পা দুখানি—

গোধূলির কাঁচা ছবি নাপ্‌তের দোকানে লাগাতার
যেভাবে টাঙানো থাকে, সেইভাবে, ঠিক সেইভাবে।

কাগজের নৌকো জলে চুয়াল্লিশ বছর পড়ে আছে।
পালটেছে ছাঁচতলা, ছন্দ, গন্ধ ও বাতাস
বুড়োখোকা বসে গেছে উঠোনের পাশে!
সেই কাগজের নৌকো আজো জলে ভাসে
গুরুত্ব মানে না কোনো সংবাদের সুখের-দুঃখের
রক্তবর্ণ ছাপছোপ, দাঁড়িকমাশূন্য বাংলাভাষা,
পরীক্ষানিরীক্ষা গদ্যে, যাত্রাসম্মেলন, আগুপিছু।
কিছুই না-মেনে, সেই কাগজের নৌকো ভেসে যায়
মেধার বিষণ্ণ অগ্নি পোড়াতে পারে না।

কেন?

কেন অবেলায় যাবে? বেলা হোক, ছিন্ন করে যেও
সকল সম্পর্ক! যেন গাছ থেকে লতা গেছে ছিঁড়ে
একটি বিষণ্ণ লোক থাকে যেন হাস্যময় ভীড়ে

কেন অবেলায় যাবে? বেলা হোক, ছিন্ন করে যেও
সকল সম্পর্ক

তাঁর কাছে

এ পথ পশ্চিমে গেছে, ঐ পথ পুবে
তুমি কোন্ পথ দিয়ে দুয়ারে পৌঁছুবে?
ভেবে রাখো
যেখানেই থাকো
তোমায় তাঁহার কাছে যেতে হবে।

তন্ময়তা

আগুন ধরালে তার অশ্রু ঝরে পড়ে
সে যেন মোমবাতি, যার আলো দেওয়া কাজ
জলের ভিতরে যেন স্থলের জাহাজ
বাড়ির মতন স্থির, দুয়ার জানালা—
সব ও সমস্ত আছে, নিয়ন্ত্রণ আছে—
তুমি যাও, তুমি যেতে পারো
সে তোমায় তন্ময়তা দেবে।

তার মমতা

শুধু নিজেকেই দেখবো—এই মনে করে
সমুদ্রে গিয়েছি, কিন্তু, সমুদ্র দেখায়
অন্যকে ছাখে না, তার চোখে নীল জল

শুধু নিজেকেই দেখবো—এই মনে করে
জঙ্গলে গিয়েছি, কিন্তু জঙ্গল দেখায়
অন্যকে ছাখে না, তার শরীর সবুজ

শুধু নিজেকেই দেখবো— এই মনে করে
রমণীর কাছে গেছি, রমণী দেখায়
অন্যকে ছাখে না, তার অহংকার ভারি

শুধু নিজেকেই দেখবো—এই মনে করে
গর্ত খুঁড়ে ঢুকে গেছি, গর্তটি দেখায়
আমাকেও ছাখে, তার অসীম মমতা।

ভাত নেই, পাথর রয়েছে

বছর-বিয়োনী মেঘ বৃষ্টি দেয়, বজ্রপাত দেয়—
ডোবা-র রহস্য বাড়ে, পদ্মপাতা দিঘিতে তছনছ।
শিকড়, কেঁচোর মতো, জীবনের অনুগ্রহ পায়,
পায় না মাথার ছাতা, এক হাতা ভাতের মানুষও!

মানুষ বারুদ খুবই ভালোবাসে, ধূপগন্ধ যেন

আকাশপিদ্দিম গেঁথে মন্ত্রী যায় সানাই বাজাতে,
পুলিস-মেথর যায় ঝাঁটা হাতে জানাতে বিদায়—
দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই, লাগে ভালো!

সমস্যার সমাধান পায় ভূয়োদর্শী রাজবাড়ী—
অত্যন্ত সহজে, শুধু মানুষ পাথর নয় ব'লে
পরিত্রাণ পেয়ে যায়। অথচ পাথরে যদি মারো,
ঘা দাও, অমনি বগা ফোঁস করে, ঐতিহ্যমণ্ডিত
দেশের পাথর যদি ছেদ্‌রে যায়, বিদেশ কী কবে!
ছাত নেই, ভাত নেই—কোন্ কাম পাথরে, মচ্ছবে—
তোমাদের?

ছেলেটা

ছেলেটা খুব ভুল করেছে শক্ত পাথর ভেঙে

মানুষ ছিলো নরম, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো।
অন্ধ ছেলে, বন্ধ ছেলে, জীবন আছে জানলায়!
পাথর কেটে পথ বানানো, তাই হয়েছে ব্যর্থ।
মাথায় ক্যারা, ওদের ফেরা···যতোই থাক রপ্ত
নিজের গলা দুহাতে টিপে বরণ করা মৃত্যু···

ছেলেটা খুব ভুল করেছে শক্ত পাথর ভেঙে

মানুষ ছিলো নরম, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো।
পথের হদিশ পথই জানে, মতের কথা মত্ত···
মানুষ বড় শস্তা, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো!

মানুষ কিভাবে মরে

মানুষ কীভাবে মৃত হয়ে আছে, নিজেও জানে না!
জানে না বলেই মৃত, তার উপর বৃষ্টি দেয় মেঘ—
বান দেয়, টান দেয়—কাছে থেকে দূরে নিয়ে যাবে
এটুকু শপথ তার, স্মৃতি বলে রাখবে না কিছুই,
ফটোগ্রাফ, পা দুখানি, কোনোমতে আল্‌তায় রাঙানো—
পা দুখানি বড়ো-ছোটো, মৃত্যুর অত্যন্ত পরে-তোলা
রাঙা ভাঙা পদচ্ছাপ, জল সরে গেলে অভিমান
পড়ে থাকে যার নাম প্রতিষ্ঠান, পৃষ্ঠপোষকতা···

মানুষ কীভাবে মৃত হয়ে আছে নিজেও জানে না।

নিজেও জানে না ব'লে মরে যায় বিবাহের পর
সন্তানের বিশ্বরূপ দেখার পরেও মানুষের
মৃত্যু হয়, পুনর্জন্ম আশা ক'রে, জলে মরে, বানে!
বন্যা খুব তীক্ষ্ণ শব্দ, ও শব্দ আমার ক্ষতি করে
মনে হয়, ভেসে যাই কোনমতে শুয়োরের সাথে—
ডাঙ্গা থেকে টেনে-আনা-সাপ চলে সাঁতারে আবার
বেনোজল খুঁড়ে যায় মানুষের সংসারের সবই।
বাঁচায় দুঃখের কিছু খুঁদকুড়ো, বাবুদের-দেওয়া
বাঁহাতের দান-ধ্যান এবং নারীর মৃতদেহ।

পাতার শোকে

তরুণ কবি কখন তোমায় বলতো লোকে ?
কোন্ বয়েসে থমকে গেলে সুশ্রী দেখায় ?
অন্তরে এই সবুজ পাতা, জংলা হরিণ—
সংঘে এবং সমষ্টিতে একলা, একা।

তরুণ কবি কখন তোমায় বলতো লোকে ?
এখন সবাই আগবাড়িয়ে বৃদ্ধ বলে—
বৃদ্ধ এবং মরচে-পড়া ধোঁকার টাটি।
ফুলগুলো সব ঝরলো, তা কি পাতার শোকেই ?

গাছের নিচে

গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতন
ফুল ফুটেছে সেই মানুষের বুকের ধারে
পাতার শাখায় হারিয়ে গেছে মুখটি তাহার
গাছের কাছে পারলে হারে
গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতন
ফুল ফুটেছে সেই মানুষের বুকের ধারে।

শুকোয় না তার ফুলগুলি আর সবুজ পাতা
ডালপালাতে মৃত্যু এসে রাখে না পা
শিকড়গুলি কাঁকরমাটি জড়িয়ে ধরে
প্রেমের দুটি হাতের মাঝে মুখের গড়ন
গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতন
ফুল ফুটেছে সেই মানুষের বুকের ধারে।
তার শাখায় হারিয়ে গেছে মুখটি তাহার
গাছের কাছে পারলে হারে।

পোড়াতে চাই

দরজায় কয়েকটা ফুটো, কুঠো কিছু লোক ভিতরের
আগো অন্ধকারে বসে পোড়াচ্ছে কী যেন।
গন্ধবাস গুগোট হাওয়ায়···ফুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে
পাক হচ্ছে।
ইটের মাথায় চাপা বকুনোয় সেদ্ধ হচ্ছে কিছু
কাঠকুটো নেই, কবিতার কিছু বই, খবরকাগজে মোড়া
ঘাসপাতা থেকে তৈরি জাব হয়তো বেটে খাবে কিছুটা বিলোবে
রাজনীতি ভাষ্যকার নেমন্তন্ন খাবে এসে মাঝরাতে চাঁদের মতন
বলবে, গূঢ় গুহ্য তার ছলাকলা তীব্র ইন্দ্রজাল,
কালো টাকা আলো করা মেসিনের নমুনা দেখাবে।
কুঠো লোকদের ঐসব কিছু জানাও দরকার—
কাজ চাই, কিছু কালো কাজ চাই—ফুটো খুঁড়ে আলো
এঘরে আসুক, তার আগে
নজরবন্দীর সংখ্যা কীভাবে বাড়ানো যায় তার হিস্তা হোক।
ফোলা ফাঁপা মিছিলের মতো লোক এখানে দরকার
কুঠো লোক এখানে দরকার
কাঠকুটো নয়, কিছু কবিতার বই চাই উনুন ধরাতে
যার কোন দাম নেই তেমন লেখক কিছু এখানে পোড়াতে
চাই।

কথা বলছে না

কেউ কথা ছড়িয়ে কথা বলছে না
কেউ কথা ছাড়িয়ে বলছে না
মাছের গা থেকে তুলে আঁশ
ফলের গা থেকে তুচ্ছ ধুলো
কেউ কথা ছড়িয়ে বলছে না

জড়িয়ে-জড়িয়ে লতাপাতা
কেউ হেঁটে যাচ্ছে কোনমতে
দাঁড়িয়ে পড়েছে স্থির ছবি
কেউ পথে সহজে চলছে না
ধানক্ষেতে বাতাসের মতো
কিংবা ঝুঁকেপড়া ঝর্ণাজল
কেউ কথা ছড়িয়ে বলছে না
বুকে-হাঁটা জড়িয়ে-জড়িয়ে
কেউ কথা ছাড়িয়ে বলছে না

মানুষের সত্যি কী হয়েছে ?

এই ছোট সংসারে দীর্ঘতা

ছোট ফুল লতাপাতা, ছোট ডালপালা
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছোট। এই ছোট সংসারে দীর্ঘতা
দাঁড়াবার জায়গা পেলো প্রকৃত উঠোনে
ঘরের বিছানা তাকে পরিপূর্ণ ধরেনি কখনো।

অপ্রকৃত বারান্দায় ছাদ ছিলো পিঠের উপরে
মাথা নিচু করে শুধু প্রাণ রক্ষা করবে না ব'লেই
সে দীর্ঘ লোকটি ভালবাসতে তীব্র বাহিরের আলো
গলিতে আঁটবে না তাকে, জেনে, যেতো সদর সড়কে
সড়কে ধরবে না বলে চলে যেতো ময়দানের ঘাসে
ময়দানে যদি না আঁটে, ভেবে, যেতো সমুদ্রে, গভীরে
এরই নাম অস্থিরতা।

এই অস্থিরতা আজ স্থির-ছবি দেয়ালে আমার—
দৃষ্টিতে সবুজ পাতা টলোমলো করেছে কৌতুকে

যেন কথা বলে ওঠে সেই তাঁর দীর্ঘতা চঞ্চল
কখনো-সখনো, আর ভেসে ওঠে সাশ্রু তিরস্কার
—পাথরের মতো ঐ ঘর ছেড়ে বাহিরে চলে যা,
এখানে কী কাজ তোর ?

মানাতে পারতো না বড়ো-মেজো-সেজো, শান্ত লুকোচুরি
অন্যায়ের বিপরীতে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যেতো
প্রতিদিন, ছোট ফুল ফুটে উঠতে দেখলে কি অধীর
হতো, দ্রব হয়ে যেতো খোয়াই-পাথর মুখচ্ছিরি !
—সততা ও সুন্দরের বড়ো কষ্ট ! বড়ো অধীনতা !

ভালোবাসা, তার কাছে

ভালোবাসা তার কাছে ভূমি থেকে পাথরের মতো
নদীর রেখার থেকে নদীপাড়, জঙ্গলমহাল
ভালোবাসা তার কাছে গাছ ফুল পাতার মতন
স্বাভাবিক। ভালোবাসা ভূমি থেকে পাথরের মতো।

ভালোবাসা তার কাছে শিকড়ের মতো মাটি-মাখা
শামুকের মতো থাকে সিঁড়ির রানাতে ঢেকে মুখ
ভালোবাসা তার কাছে গাছের পাতায় লাগা হাওয়া
ভালোবাসা তার কাছে ক্রমাগত ভীষণ অসুখ।

জামা কতদিনে ছেঁড়ে

মানুষ যখন কাঁদে, মানুষের সাধ্য কি, থামায় ?
নদীর নিকটে গিয়ে কাঁদে, কাঁদে পাথরের পাশে
মাঠের ভিতরে গিয়ে কাঁদে একা চোখ তুলে আকাশে—

সাধ্য কি, থামায় তাকে ? একা কাঁদে, সংঘে কি কাঁদে না—
মানুষ যখন কাঁদে, মানুষের সাধ্য কি, থামায় ?
চোখ ফেটে রক্ত পড়ে, সেই রক্ত উজ্জ্বল জামায়
লেগে থাকে, বৃষ্টিজল ধুলো থেকে মুক্ত করে পাতা
রক্তের উপরে তার জারিজুরি খাটে না কিছুই
জামায় রক্তের দাগ পিছু-ফেরা বিপ্লবের মতো
থাকে, জামা কতদিনে ছেঁড়ে ?

আমি চাই

মাঝে মাঝে স্পষ্ট কোন ধ্বংসের ভিতরে আমি ঢুকে যেতে চাই
যেখানে নিষিদ্ধ যাওয়া, সেখানে সার্কাসে—ব্যর্থ, ভাগ্যহত আরেক ক্লাউন
দর্শক কীভাবে বসে ? খেলা ছাখে, বগল বাজায় ? মাঝেমাঝে—
এতো স্পষ্ট, রোদ্দুরে পুড়ন্ত তামা, ছেঁড়া জামা, কুহকে পথিক
যেভাবে বিচিত্রগামী, যাই আমি—ধ্বংসের ভিতরে ঢুকে, মুখোমুখি
দাঁড়াই জীবনে, চোখ মারি, আয়নার স্পর্ধাকে করি কাঁধ ঝেঁকে কুর্নিশ এবং
নিজের পেণ্টুলে মূর্তি—অস্তি-নিরস্তিত্ব কম্পমান
ঘরের বাইরে রোদ মিছিমিছি দ্রুতপায়ে হাঁটে
যেন আপিসের শেষে মাইনে আছে, কানাকড়ি আছে আর
পাঞ্জাবি রেস্তঁরা
থালা-ভরা বুনো মোষ মত্ত হাতি, মর্কট বেবুন
আমাদের নেশাখোর পেটে আসবে ব'লে যেন প্রহ্লাদ ছড়িয়ে দুই বাহু
নৃত্য করে—রামনাম সত্য, এই গায়
লোক বলে, এখনো যে চায়
বাড়ি করতে পারে ঐ গড়িয়ার দিকে···
আমি চাই বাড়িটি করিয়া—
একদিন শেষ স্পষ্ট নিজস্ব ধ্বংসের মধ্যে ঢুকে যেতে চাই।

সময় হয়েছে

সুন্দরের হাত দুটি বেঁধে দাও, সময় হয়েছে।
বাগানে অজস্র ফুল ফুটে আছে
পাতাগুলো ভালো
রং-এর বাহারে তার কোনোটি জমকালো
কেউ সাদাসিধে
সুন্দরের হাত পড়ে অগ্নি ও সমিধে
তার সবই চাই
সে হাত বাড়ায় চারিদিকে
লোলুপ অগ্নির মতো সে হাত বাড়ায় চারিদিকে
হাতে ও জিহ্বায় চাই বাগানের ফুল
গভীর বিষণ্ণ, কালো—মানুষের ভুল
সমস্ত, সমস্ত, সব।

সুন্দরের হাত দুটি বেঁধে দাও, সময় হয়েছে।

ভিক্ষা চায়

খরগোসের মতো মুখে রোদ্দুরে ঠোকরায় ঘরে পড়ে
জানলা গলে যেন কটি খরগোসের মুখ লাল মেজের উপরে
ছোলা খোঁজে, ঘাসবীজ
রোদ্দুরের সঙ্গে কিছু ভিখারির শীতের আঙুল ভিক্ষা চায়
এখন নিরন্ন ঘরে তাকে ভিক্ষা দেবো
হাতে গুঁজে দেবো বুনো ভাং, শুকনো পাতা
মানুষের কাছে কাঁচা সবজি নেই, গাছপালা নেই
টিন ভর্তি হয়ে আছে মাছ, কাঁচা ফলমূল সবই
গত শতাব্দীর কিছু পানপাত্র আছে
স্মৃতির সর্পিল দাগ, সুসময়, তুলো

রোদ্দুরের সঙ্গে কিছু ভিখারির শীতের আঙুল
ভিক্ষা চায়…
ভিক্ষা কাকে দেবো ?

এই পরিশ্রম

লোকটিকে জানায় এই গাছপালা বাংলোর সমাধি
এখন, কয়েকটি দাঁত খসে গেছে শীতে
বুকের খাঁচায় টান পড়ে আচম্বিতে
পাখি নেই, পালক রয়েছে।

বারান্দার একপাশে হলুদ ডালের মতো হরিণ-রোদ্দুর
জঙ্গলের তাড়া খেয়ে চুপ করে আছে
জীবনের ছবি এই, এইটুকু রোদ্দুর পোহাতে
সে লাঠিতে ভর দিয়ে দিনের করাতে
কাঠ কাটতে যায়, কিছু পরিশ্রম করে
উনুন ধরায়, কিছু পরিশ্রম করে
ঢাকে কাঠি দেবে বলে পরিশ্রম করে
নিজেকে সপ্রাণ করে যেমন মানায়
—এই পরিশ্রম করে।

মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে

একটি মানুষ হঠাৎ কেন শব্দ করে—
তালি বাজায় ?
পাথর দেখে ভয় পেয়েছে।
মানুষটা কি পাথর নিজেই ?

পরস্পরের আলিঙ্গনে জ্বলবে আগুন ?

ভয় পেয়েছে।
একটি মানুষ মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে।

জঙ্গলে সে ভীষণ যেতো অবশ্যত
জঙ্গলে সে বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছে।
লক্ষ্মীঠাকুর যেমন হাঁটেন উঠোন জুড়ে—

মানুষ ধূপের ধুনোর গন্ধে ভয় পেয়েছে
মানুষটি আজ মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে!

একটি স্রোতে

আমার বুকেও অল্প কিছু
ভালোবাসার গুচ্ছ নিচু
ক্ষেতখামারে
নতুন জলে দুখানি হাত
হঠাৎ যেন জলপ্রপাত
এই পাহাড়ে!
পাহাড় তো নয় স্থলভূমির
মধ্যে আছো দাঁড়িয়ে তুমি
এবং আমার
বুকের ভিতর ইতস্তত
সবুজ রবিশস্যে নত
বৃষ্টি নামার
আকুলতায় পানসি উজান
মনের মধ্যে কার ছবিখান
হচ্ছে গুঁড়ো

আমার মতো দুঃখে-সুখে
একটি স্রোতে ভাসছে বা কে—
পাহাড়চূড়ো ?

কী জানি

ঝিঁঝিঁর ক্রন্দন, গান—তাও ভোরবেলা
আমাকে বোঝায় সন্ধ্যা
বেপরোয়া ছায়া ফিরে চেপে বসে স্তম্ভিত দেয়ালে
বেড়ালের মতো পাংশু
লোভে তার পড়োশি তছনছ
আমি লোভী···একত্র আহার
সন্ধ্যারও সমাপ্ত ভোরে
সেরে রাখি
কী জানি কী হয় !

অঙ্গুরী তোর, হিরণ্য জল

তোমার হাত ছুঁয়েই আমি ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ পেলাম
বিদায় নেবার অনেক আগে কিছুক্ষণ কি হেসেছিলাম ?
তুমি জানো—দূরত্ব আর
মুখবোজা শাঁস পড়ে রয়েছে মধ্যে আমার।

তবু চলেছে সময় বহে, সভ্যতা নীল, পক্ষী ভালো
বিশ্বাসিনী রাত্রি আমার এমন কালো
দুহাত ঘুঘু ছড়িয়ে আছে হৃদয় জুড়ে
আর কিছু নয়—আর যা আছে নীল পাথুরে
অঙ্গুরী তোর, হিরণ্য জল, মন্দ-ভালো !

কবিতা লেখার ক্লান্তি

কবিতা লেখার ক্লান্তি আমি আর বইতে পারবো না
তার চেয়ে এই ভালো ধুলোমাখা মণ্ডপের শপ্
গুছিয়ে সনেটে তোলা, মহাপ্রভু গেছেন রোদ্দুরে
জুড়োতে পাথর তাঁর···এইমাত্র লুট হয়ে গেলো

মহাপ্রভুতলা শান্ত, ভক্তেরা সুন্দর, ছুটি নিই
আমাকে মঞ্জুর করো, আর্জিপত্রে টিপছাপ দাও
আমি শপ্ গুছিয়ে রেখেছি
সনেটের মতো শক্ত, এক বছর বাঁদে বোধ্য হবে
এবং মজুরি আমি নিতে এসে তছনছ আগুনে,
পুড়ে মরবো···শান্তি শান্তি
কবিতা লেখার ক্লান্তি কিছুতেই বইতে পারবো না ॥

কাছে এসো, ব'লে তুমি

এক সময় আমার দুটো হাতই ছিলো না
তুমি আমার মুখ ধুইয়ে দিতে
মুছে দিতে প্রাত্যহিক ধুলোবালি, গা করে তুলতে
মণ্ডপের মতন সেবার উদ্ধার···
সে সময়টা ভারি জ্বর কেটেছে
গায়ে দোলাই
রোদ্দুরের কোলে এনে সঁপে দিতে আমাকে
আমি সারাদিন মনে মনে তোমার সমর্থ স্বপ্নে ভেসে বেড়াতুম।
একদিন হঠাৎ পা দুটো থেকেও সহায় ছেড়ে গেলো
হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, এবার তোমাকে সম্পূর্ণ পাবো
আমার যে সব গেছে, চিৎকারে
জানালুম তোমায়।
কাছে এসো, ব'লে তুমি, অনেক দূরে সরে গেলে!

আমি সে মৃত্যুর পাতে

থেকে-থেকে তার এই জলের মতন ফিরে-আসা
আমাকে ভাবায়, ভাঙে—যেন বালি, টেনে নেয় বুকে,
মায়ের মতন ছেলে, মমতায়—রক্তে মুখ ভাসা
উত্তরাধিকার, যেন বসন্তই ফোটালো কিংশুকে !

এতো গ্লানি, জীবনের ক্লান্তি এতো, মুছে যায় মুহূর্তে বিপুল
সমুদ্রের কাছে এলে, ছেলেবেলা লতার মতন
যেমন জড়ায় তাকে, দেবদারু-বীথির সম্বল
গভীর মমত্ববোধ—সমুদ্রের সারল্য এমন
যার কাজে জীবনের মৃত্যুর মতন তীব্র ঘৃণ
পুরোনো ক্রন্দন তার থামায় এবং যায় মরে
সরে যায়, আর না জাগার জন্যে, নিশ্চিন্তে, বেঘোরে
আমি সে-মৃত্যুর পাতে ভোগ করি তুচ্ছ সিন্ধুজল !

এ-কাপড় শুকোনো যাবে না

মিথ্যে, জল নিংড়ে আর এ-কাপড় শুকোনো যাবে না
মিথ্যে, হিংসা এসে ছিঁড়ে মানুষের রক্তও খাবে না
এখন শান্তি, ওঁ শান্তি, দাবা জুড়ে ধানের মঞ্জরী
দোল খায় সুবাতাসে, এখন জীবনে সহচরী
একাধিক, লক্ষণীয় ঘর কেউ গড়ে না সঞ্চয়ে
সকলে বাহিরে থাকে, গেরস্তের মতন অন্বয়ে
এখন বাংলার লোক সুখে আছে সদাসর্বক্ষণ
দাবায় চালের বস্তা ফুটো করে ইঁদুর, দুশমন।

তুমি তাঁরই জটিল সন্তান

[বিষ্ণু দে শ্রদ্ধাস্পদেষু]

যদি থাকি, এলোমেলো, রুপোর সিন্দুকে কিংবা
ঝুলপড়া ম্লান কুলুঙ্গির জিরের কৌটোয়
একাকী, অব্যর্থ কোনো
ছোটোবেলা-থেকে-খসা মাদুলির মতো
তাহলে কী মানে হয় ? হয় না, সেহেতু
আমি থাকি, না-ই থাকি
তোমার কি যায়-আসে বলো ?

জোনাকি যেমন নেয় সমুদ্রের বুকের উজ্জ্বল
ফসফরাস, যায় আসে সমুদ্রের সত্য কোনো কিছু ?
তেমন আমিও যদি তোমার অলক্ষ্যে নিই পিছু—
চলে যাই, যেখানে যাইনি আগে
তীব্র বারান্দার

এককোণে ছায়া ফেলি মিশে গিয়ে সুপারির মতো
তাহলে কি কাণ্ড হয় সত্যকার, হতেও তো পারে
জীবনে এমন বস্তু পায় না দুর্ভিক্ষ বারেবারে—
ক্ষুধা কিংবা তারো চেয়ে অপ্রখর আদি বাসনাতে
যদি থাকি, এলোমেলো, রুপোর সিন্দুকে, শূন্য হাতে
চিরভিখারির মতো
যেন গানে রবীন্দ্রঠাকুর
তোমাকে আপ্লুত করে, তুমি তাঁরই জটিল সন্তান
অধুনা-ধূলির ঝড়ে, সমাজিয়া চৈতন্যে ভরপুর—
আসলে কী দিয়ে থাকে ? তোমার স্বভাবে রাঙাশাল—
আমার প্রগতিবোধ সবেমাত্র ঘুচে গেলো কাল !

নীল একটি ছেলে-ভুলানো ছড়া

নীল একটি ছেলে-ভুলানো ছড়ার মতো দিনগুলি যায়
হাওয়ার ভিতর ভাসতে-ভাসতে যেমন গন্ধ
মনের মধ্যে যেমন-তেমন এক রমণী মুখচ্ছবির
খোলা জানলা, দুয়ার বন্ধ।

সহজ

ছেড়ে দিলেই পারি
এই যে বাগান, ফুলের বাগান—বকনো সরা হাঁড়ি
ছেড়ে দিলেই পারি।
সিংদরজা, পদ্মপুকুর, ভাঙা হৃদয়, বাড়ি
ছেড়ে দিলেই পারি।
ছাড়া তো খুব সহজ,
এবং ছাড়া তো খুব সহজ!

কিছুটা

কিছু ঘাস মুঠোয় উঠেছে, কিছু ঘাস আঙুলের ফাঁকে
গলে গিয়ে, বুঝিয়ে দিয়েছে :
সর্বস্ব তোমার আমি নই।

কিছু তুমি পারো, কিছু আমি
কেউবা নিষ্কাম, কেউ কামী—
কিছু তুমি পারো, কিছু আমি,
নিশ্চিতই কিছুটা অন্যলোক,
বড়ো মেজো সেজো ছোটো হোক—
কিছুটা তো পারে অন্য লোক।

প্রীতিভাজনেষু

[সুরঞ্জন সরকারের স্মৃতির উদ্দেশে]

শেষ ও নির্দিষ্ট একটি বাড়ি পেতে চেয়েছিলে প্রীতিভাজনেষু
বিষয়ী বিষয়হারা মানুষে পৃথক না করেই
অসহায় চিঠি দিতে বাড়িঅলা, ভিখারির কাছে :
খড়ে মাথা গুঁজে থাকবো, কুটো আঁকড়ে, নিতান্ত ডোবায়,
কুয়োয় ব্যাঙের মতো, তাই দাও, নদী ফেলে আসি
নদীতে অনেক স্রোত, এ-বয়েসে তার সঙ্গে যোঝা
খুবই শক্ত, দেহকূপে অবাধে ঢুকছে
ঘুণ, কুরে কুরে খায়, ঘুরে ঘুরে খায়…

'যমেও নেয় না তাকে, আমাদের বুড়ী ঠাকুমাকে'
নেয়, দিতে পারলে দেয়, কোল দাও বলে
ডাক দিলে কোলে নেয়, চিতা মাতৃমুখী…
বাড়ি কি পেয়েছো তুমি, নির্দিষ্ট অশেষ
এতোদিনে, প্রীতিভাজনেষু ?

আমি দেখি

গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও
আমার দরকার শুধু গাছ দেখা
গাছ দেখে যাওয়া
গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্যে ঐ সবুজের ভীষণ দরকার

বহুদিন জঙ্গলে কাটেনি দিন
বহুদিন জঙ্গলে যাইনি
বহুদিন শহরেই আছি

শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়
সবুজের অনটন ঘটে···

তাই বলি, গাছ তুলে আনো
বাগানে বসাও আমি দেখি
চোখ তো সবুজ চায় !
দেহ চায় সবুজ বাগান
গাছ আনো, বাগানে বসাও।
আমি দেখি ॥

কলকাতার বুক:পেতে বৃষ্টি

চাইনি, হঠাৎ বৃষ্টি, টগবগিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের
মতো বাজলো টিনসেডে, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো ফুল।
জঞ্জালের টিলা বেয়ে কষ নামলো, ভিন্ন কালীঝোরা—
বাংলোর বদলে যতো বদখত বাড়ির সুমুখে
কলকাতার, বৃষ্টি এলো, বৃষ্টিতে ভাসিয়ে চললো গলি—
গলির ভিতরে গল্প, কাঁথাকানি, আঁশথোসা সবই
মধ্যবিত্ত মানুষের ঘরের ওমোট, অগোছালো
কাগজের রীতিনীতি, ভোটপত্র, শুকনো কুচো কাঠ—
এইসব। বৃষ্টি থেকে বৃষ্টির চড়ুইভাতি তার,
কলকাতার কাজে লাগে, মরাঘাস—তারও কাজে লাগে।
এদিকে আঁতুড়ঘর, অন্যদিকে নিমতলার ছাই
জন্মমৃত্যু, খুঁটিনাটি বৃষ্টিতে বিন্যস্ত হয়ে থাকে।
মখমলের খোলে শোয় অনিবার্য কাপাসের তুলো,
কলকাতার বুক পেতে বৃষ্টি একটু রাত করে শুলো ॥

এভাবেই যাবে ?

সারাদিন কাজ ক'রে সন্ধ্যায় মৃত্যুর
ভিতরে সেঁধিয়ে যাওয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে—
এভাবে কি দিন যাবে ? এভাবে কি যাবে ?

গলির ঘুমন্ত পিঠ মাড়িয়ে-মাড়িয়ে
গোল্লাছুট ফিরে আসা কুকুর তাড়িয়ে—
এভাবে কি যাবে দিন ? এভাবে কি যাবে ?

আঁধারে পিছলে সরে রমণীর শাড়ি
স্বপ্নকে সাহায্য করে স্তব্ধ নীল বাড়ি
এভাবে কি যাবে দিন ? এভাবেই যাবে ?

মৃত্যু টুকরো-ফুকরো হয়ে বসে আছে পাশে
কলকাতার রাস্তা ভেজে গঙ্গার বাতাসে
এভাবে কি যাবে দিন ? এভাবেই যাবে ?

ইছামতী : বালিতে পায়ের দাগ

বালিতে পায়ের দাগ, বোঝা যায়, ওপরে ও নিচে
গিয়েছো প্রত্যেকবার, ইচ্ছা ছিলো অন্তরে ফেরার…
কবিতার কাছে গিয়ে রাখা শব্দ, প্রাসাদ-প্রস্তুতি
কিন্তু, গড়া হয় না স্বভাবে
ইছামতী জানে সব
তুমি এর মর্মছেঁড়া তার কীভাবে বাজাতে পারতে
সব জানে।

ভাঙাবাড়ি নিশ্চিতই গন্ধের হা-ঘরে ছায়ায় ম্লান
ভাঁট ভাঙে অচল জানালা

অতীতের নেবুগন্ধে পুষ্টিভাত তখনো উজ্জ্বল
হয়ে আছে। কিংবদন্তি ত্রস্ত পায়ে ঘাটে নেমে আসে

বালিতে পায়ের দাগ, বোঝা যায়, ওপরে ও নিচে
গিয়েছো প্রত্যেকবার, ইচ্ছা ছিলো অন্তরে ফেরার…

আগুনে যে-দুঃখ

আগুনে যে-দুঃখ ছিলো, সেই দুঃখ বাতাসে নিভেছে
গিয়েছে কয়লায়, কাঠে—তারপর লুকিয়ে মাটির
ভিতরে পোকার মতো, সেই দুঃখ নিভেছে নদীর
চুড়ান্থেকে-আনা জলে। নিভে গেছে। আগুন নিভেছে।

নিভন্ত আগুন নিয়ে খেলা করে শিশুর মহল
উঠোনে, মাচার পাশে—কাদার উপরে কাটাকুটি
খেলে ওরা, ভয় পায়, যে-বাতাস নেবার আগুন
সে যদি আগুন জ্বালে, বাতাসে বাতাসে ছোঁড়া মেঘে—
তাহলে, নিষ্কৃতি কই, কোথায় নিষ্কৃতি পাবে ওরা ?
ঐ শিশুদের দলে আমি এক পঙ্গুকে দেখেছি ॥

একা

সুন্দর, এখনি কেন চলে গেলে ? বলেও গেলে না ?
সুন্দর, তোমাকে এই বৃদ্ধ কবি সমর্পণ করে
প্রাণ, যা কৈশোরে-মেশা, অথবা সে মৃত্যুরওঁঅধিক—
পিছলে-প'ড়ে চলে গেলে অমৃতের জলের সহিত
এভাবে কখনো যেতে, চলে গিয়ে ফিরে আসতে মেঘে
বৃষ্টির মতন, ঐ হাসি, ঐ পর্যটনময় বেলফুল

এখনো সন্ধ্যায় ফোটে, জানালায় দাঁড়িয়ে রয়েছে
ও কে ? ঐ তার মতো ? যে-কিশোর সন্ন্যাসে গিয়েছে
তার মতো ! বলো ও কে ? জানালায় দাঁড়িয়ে রয়েছে
একা !

ভয় আমার পিছু নিয়েছে

জঙ্গলে গিয়েছো তুমি একা একা, জঙ্গলে যেও না
তুমি, মানে তুমি, মানে তুমি, ভুল বৃদ্ধ—ওহে তুমি
জঙ্গলে গিয়েছো একা ? হারিয়েছো পথ ?
সর্বস্ব হারিয়ে কোনো অন্নপূর্ণা গাছ ধরে জড়িয়ে কেঁদেছো ?
পাতা চেয়ে ফুল চেয়ে রস-আঠা চেয়ে
দাঁড়িয়েছো ? ঠায় গাছ যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে বহুদিন ধ'রে
একা, তার আর্শি হয়ে, পারা-চটা আর্শি হয়ে, সিঁথির সিঁদুর হয়ে, পা-র আলতা হয়ে
তুমি দাঁড়িয়েছো কিনা। নিজেও জানো না,—এই
জানা, বহু অর্থ দাবি করে, দাবি রক্ত, অসম্মান, তুলোধোনা পিছমোড়াবাঁধা
সিঁড়ি ভেঙে বস্তার গড়ানো, দাবি—চাবি নিয়ে রুগ্‌ণ তালা খোলা
দাবি তার বহুবিধ, দাবি তার সন্ন্যাস গৃহেই, দাবি ছেঁড়াখোঁড়া জামা
নিচে নামা, গড়াতে গড়াতে—যেভাবে পাথর নামে, গাছ নামে, মানুষেও নামে
ভয় পেয়ে নয়, শুধু তাড়া আছে ব'লে, তার কমলার বন থেকে, ভুটান পাহাড় থেকে
মানুষ যেভাবে নেমে আসে, নেমে থমকে যায়, ধাক্কা খেতে হবে ব'লে এই ভয়ে
চুরমার হতে হবে এই ভয়ে, থমকে, থেমে, পা তুলে দাঁড়ায়
ভাস্করের, ছেনি-কাটা ঘোড়ার উড়ন্ত ব্রোনজ যেভাবে দাঁড়ায়
সেইভাবে।

জঙ্গলে যেও না, বাড়ি চলে যাও, উঠোনে দাঁড়াও।
টাকার মতন চাঁদ মাথার উপরে কোনো শব্দ নেই, তারার বাতাসা
মহাপ্রভুতলা জুড়ে পড়ে আছে, ছড়িয়ে রয়েছে
মেঘ ও ধুলোয় মাখা, রাঙা শাঁখা ভেঙেছে যেখানে

সেই শ্মশানের মতো এই বাড়ি, মানুষের বাসা
মানুষ এখানে ভালোবাসা নিয়ে, আঁশবঁটি নিয়ে নিম ঘুমিয়ে রয়েছে, নিমঘুমে
সে-ঘুম ভাঙাও তুমি। অন্নপূর্ণা, ভাত দাও ব'লে
মানুষকে জাগাও, ভাত পাবে
নুন পাবে, পানতুয়া চুন পাবে, পাতাপোড়া গন্ধ পাবে, যেমন জঙ্গলে
জন্তু ও মানুষ পায়, মাকড়শাও পায়।
তন্তুজাল পুড়ে যাবে এই ভয়ে সে গিয়ে লুকোয় গাছের ছালের খাঁজে
ভয়, শুধু ভয়, শুধু ভয় জেগে থাকে
টাকার মতন রূপো মাথার উপরে, তারো ভয় খুচরো হতে-থাকা
হাত থেকে হাতে ঘোরা, রাত থেকে রাতে, সন্ধ্যার জোছ্‌না থেকে
অসুস্থ প্রভাতে।
সিন্দুবাদ সিন্দুবাদ—ব'লে কারা চেঁচায় শহরে ?
বড় রাস্তা অন্ধগলি গাড়িবারান্দার নিচে এই গণআন্দোলন আর কতদিন হবে ?
চাষার মতন মাঠে গিয়ে ছাখো, মাঠ ফেটে গেছে
কোথাও থৈ থৈ জল, ধানের ফুলের গন্ধ নাকে
বাতাসে চাবুক মারে, কোন্ গন্ধ চাই ?
কোন্ সিন্দুবাদ চাই ? মাতরম্ বন্দনার ছলে তোমাদের প্রকৃত কী চাই, চাও
ভেবে দেখে বলো—
আমি দেবো। আমি আজ দিতেই এসেছি।
যা পেলে তোমার সুখ, মানুষের সুখ হবে—দিতেই এসেছি,
যদি হাতে কিছু থাকে, সব ঢেলে দেবো, কিছু লুকিয়ে রাখবো না
কিন্তু, হাতে কিছু নেই, কার জন্যে নেই ?—তুমি বলো।

কথা দিয়েছিলে, তুমি রাখোনি সে কথা।
বলেছিলে শাড়ি দেবে, হাঁড়ি দেবে,
হাঁসমুরগির মতো কাঁড়িকাঁড়ি ছানা দেবে,
ঘাটের রানার মতো মসৃণ গারস্থি দেবে পুঁইমাচা দেবে কাঁচা হলুদের মতো গাই।
মরে যাই ! মরে যাই !
পা পুড়িয়ে রাঁধি, চুল নেই তাও চুল নুটি করে বাঁধি
তিজেল মাল্‌সা নেই, ভিটে-মাটি-চাটি করে নিয়ে গেছে উই

নবাবপুত্তুর, বাবু দুই !
বলে কিনা সব দেবে, হাতে চাঁদ পেড়ে দেবে, ফেলাগ্‌টা মেড়ে দেবে
আশমানে-জমিনে

দেঁড়েমুসে খেতে পাবো, সেনেমাখাত্রা যাবো—বড়ো বড়ো কথা !
জিব খসে যাবে, তাও ভয় নেই ?
মানুষের মাঝে চরো, কথা কও বড়ো বড়ো—ভয় নেই ?
মানুষ কি গরু হয়ে জাব খাবে ? কথায় কথায় তাকে চাব্‌কাবে ?
এই গাঁয়ে এলে সবখানে কাদা, যাও ভিন্‌গাঁয়ে
কথাতেই কথা বাড়ে, যাও ভিন্‌গাঁয়ে
চরকায় তেল দাও নিজে-নিজে, কাজ নেই গাঁয়ে ঘুরে জলে ভিজে
কাজ নেই, নিজেরা নিজেই কিছু করে নেবো
কথা মিছু নয়, তাই ভয় করে, ভয় করে। শুধু ভয় করে।
ভয় নেই তোমাদের।
দাঁড়িয়েছি, তার কাছে, তার বারান্দার কোণে, সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে
দাঁড়িয়েছি, কাঁধে ঝুলি, পেটের উপরে নিয়ে দুহাত খুলেছি : কিছু দাও।
—কিছু নেই, যা আছে তোমাকে দিলে কিছুই থাকবে না।
—কিছু দাও। খুঁদকুড়ো দাও। এতোদিন বাদে এসে তোমার দরোজা থেকে
এমনি ফিরে যাবো ?
—ফিরে যাও। উচ্ছিষ্ট দেবো না। ফেরার অব্যেস আছে। আগেও ফিরেছো।
—তখন বয়েস ছিলো। কর্তালের মতো দুই কানে বাজতো খঞ্জনীর ধ্বনি
—এখনো বাজাও, ফেরো, ফিরে যাও। অনর্থ করো না।
—ভিখিরি ফেরাও তুমি এইভাবে ? নষ্ট হয়ে গেছো। কলমীর লাবণ্য ছেড়ে
শিকড় হয়েছো।
—কাজ শিকড়েরও আছে, ক্ষয় রোধ করে।
—কথা তো শিখেছো বেশ ! গুছিয়ে বসেছো। তোমার সন্তান দাও,
আমি কোলে করি
—কাঁদিয়ে কী লাভ ?
—কে কাঁদবে ? একবার দিয়ে ছাখো।
—কে কাঁদে জানো না ?
—জানি কই ? জানি না কিছুই, একবার কোলে দাও, একটি চুমু খাবো।

—এতো পাপ ? কেন এতো দেবে ? নিজের ছায়াকে করো দীর্ঘ আলিঙ্গন—
শান্তি পাবে।
—শান্তি, শান্তি, শান্তি—সেই বস্তাপচা কথা !
—আমি কি অশান্ত হতে পারিনি কখনো ?
কখনো উত্তাল হতে ?
—বৃষ্টিতে হয়েছো।
—কিন্তু সে তো ভিন্ন জল, ধার-করা, স্বাভাবিক নয়
—স্বাভাবিক মানে জানো ? তুমিও তো দোষী
—দোষ তো আমারই সব—ফেরানো ভিক্ষুকে, এর চেয়ে পাপ আছে ?
হাত ছুঁয়ে বলো
একবার দাও, আমি কোলে নেব তোমার শিশুকে
—ও তোমার কেউ নয়, কেন হাত পাতো ?
—হাত পাতি। কেন হাত পাতি ? যে-হাত ছুঁয়েছে ঐ অধরোষ্ঠ, চিবুক, কপাল—
মাথাভর্তি এলোচুল, সারাংশ পিঠের, সে যে কেন হাত পাতে, ভিখারির মতো
পরের সন্তানটুকু কোলে নেবে ব'লে হাত ! ঝুলি খুলে, কী যেন সে চায়, চায় কেন ?
—ফিরে যাও, অনর্থ করো না। জঙ্গলে একটি গাছ কেটে দিলে বিঘ্ন জঙ্গলেরই
তুমি কি জানো না ?:এতোদিন বাদে এসে কেন ভিক্ষা চাও ?
সত্যি কি ক্ষুধার্ত তুমি ?
—ক্ষুধা কাকে বলে ?
—ক্ষুধা ক্ষুধা। দেহ:ভিক্ষা চাও ? যা নিতে পারোনি আগে বাঁধনের ভয়ে,
আজ নেবে ?
চাও, নিতে পারো।
নদী সরে গেছে দূর, ঠাণ্ডা বালুভূমি, মাদুর মেঝের মতো। ক্ষুধা এতে যাবে ?
শুতে পারো, যদি ঘুম হয়, যদি স্বপ্ন ছাখো ! ফুটে শুঠা থেকে ফুল
পরিত্রাণ পায় যদি—
এসো। শুকনো শিকড় হয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াই দুজনে, চুল খুলে দিই, তুমি
এলোচুলে ভালোবাসা দিতে ! ভালোবাসা ? শিশুতেও বোঝে।
ওকে কাছে ডেকে আনি, ও দেখুক ভয়—ভয় কাকে বলে, কাকে ভয়ংকর বলে !
কাছে এসো। চোখ তুলে তাকাও। তোমাকে তো ভিখারির মতো কখনো
দেখিনি আগে—

তাই ভয় ছিলো। দিতে ভয়, নিতে ভয়। ভয় চতুর্দিকে।
ধরে-বেঁধে কষ্ট দেবো, সেই ভয় ছিলো। এখনো রয়েছে। যাও। শূন্য হাতে যাও।
আর কখনো এসো না।

মৃত ও মৃত্যুকে ভয় করে প্রজাপতি
ভয় করে ফুল, তাই হুলস্থুল বাতাসে বাগানে
বিরহী মিলন চায় কাহাদের? লিখেছেন কবি!
সেকি প্রজাপতি এসে ফুলে-ফুলে বাঁধন পরাবে? সে-কারণে?
বিয়ের মসলিন ঐ কাগজের পত্রের উপরে, মালা হাতে পরী উড়ে যায়…
গোড়ের ক্রমধ্যে দুটি বন্দী কাটা হাত, ইহজীবনের সুখ ভিক্ষা পেতে পেতে
পেতে পেতে যৌনসুখ, দুঃখ-শোক ভোলার প্রচ্ছদে
রসিক জীবনে ঢোকে, যেন উই, পাতা কেটে সুখ!

মাংসের উপরে মাছি, বসে আছি। সামনে-পিছনে
ভূকম্পন ছাড়া ধ্বস নেমে আসে, তছনছ প্রাসাদ
দেখে, ওঠে কি ক্রন্দন, সে-ক্রন্দন অবশেষে থামে
শান্ত পটভূমি হয়ে ঝুলে থাকে নরোত্তম ছবি
বালকের, পালক লেগেছে গালে, পালে পালে উড়েছে উদ্‌গ্রীব
বক, নিচে ময়ূরাক্ষী, রক্তচক্ষু মন্থর জলের উপরে মেঘের ছায়া
কবিতার মোহমায়া সর্বত্র ছড়ানো।
শিখার মতন দ্বীপে কিছু গাছ তখনো রয়েছে
তরুণ জীবন্মৃত কবির পাণ্ডুর লিপি যেন, আঁকাবাঁকা হাতে লেখা—
মৃত্যুর উদ্‌ভ্রান্ত বই, টাকা কই?
সভাসমিতির শেষে, ভালোবেসে,
মৃত, পুরস্কৃত,
অনেক উল্লেখযোগ্য ঘোষণায় খুশি হন তিনি
—যে দেখার সে-ই ছ্যাখে, সকলের চক্ষু ছ্যাখে সবই
কলরব কানে আসে, প্রকৃত তুলোয় তাঁর বিছানা ছিলো না,
দেওয়া কি যেতো না প্রেম? স্থির চাকরি, আশ্রমকুমারে!
কবি কি তুলোয় শোয়? মৃত বলে শোয়। চোখে চালশে হ'লে শোয়,
সভাপতি হ'লে। তার আগে ময়দানের ঘাসে

গ্রানড হোটেলের নিচে ভিখারির পাশে
আনন্দবাজারি সিঁড়ি, জ্যোৎস্নার পার্ক স্ট্রিট, ইস্টিশানে, স্থানে ও অস্থানে
ব্যথার কম্বল গায়ে কবি থাকে সিংহের মতন
ফাটকে, পায় না মাংস, বরং রক্তের টিকা প'রে
পরদিন আদালত। পরোক্ষে পনেরো তঙ্কা
হাতে ঘড়ি, কানাকড়ি, সমস্ত বিদায়
বিদায় অসহ্য রাত্রি, বিদায়, বিদায়···
দিন শুরু হলো।

সেদিনের সন্ধ্যা থেকে পায়ে পায়ে ভয়
কুকুরের মতো পোষ সন্ধ্যা থেকে পায়ে পায়ে ভয়
ভয়ে, দিন শুরু হলো
ভয় বড়ো ভয়ংকর। ভয় সবখানে।

শহরে ভোরের কাক ডাকে!
শিকল যদিও নেই, বন্দী—বন্দী তবু
ঘরে-পরে প্রেমে-রোষে, কোষে-কোষে বন্দী, তুমি-আমি
বন্দী ঐসব লোকও—বন্দী যারা করে!
নেহাৎ যখন শিশু, জড়িয়েছি কাঁথার সুতোয়
কোমরের ঘুন্‌সি, সেও কোমর-বন্ধনী!
বন্ধন কোথায় নেই? বন্ধন নদীতে
ইসপাত-কংক্রিট ব্রিজ—তাকে বেঁধে ফ্যালে।
গৃধ্রকুট পাহাড়ের চূড়া থেকে চূড়া বাঁধে রশি
মানুষ চেয়ারে ব'সে সেই পথ অতিক্রম করে
রাজগৃহ-শান্তিস্তূপ বিদ্যুতে-বিদ্যুতে করোজ্জ্বল—
শান্ত বুদ্ধমূর্তি, তার অভয়মুদ্রায় সহ্য করে,
ভয় পায়, সহ্য করে মানুষের ভ্রমণ-বিলাস!
—সোনার এ-রূপে স্তূপে শান্তি পেতো রাজার কুমার
শাক্যসিংহ। ইনি নন, এঁর কোনো সম্পদ লাগে না।
এ-বন্দী ক্ষমায় হাসে, আমি কাঁদি বাঁশের খোঁয়াড়ে

শিকড়ে জড়িয়ে পড়ি, পড়ে যাই, কাঁদি
কেবল নিজেকে বাঁধি, বিপর্যস্ত করি
বাঁধি চাঁদে, বাঁধি ফাঁদে, অসুখে-আহ্লাদে
বেঁধে মার খেতে থাকি, শুদ্ধ হবো ব'লে
মানুষের মনস্তাপ মুছাবো না ব'লে, তাঁর
ক্রুশবিদ্ধ রামধনু দেহখানা দেয়ালে টাঙাই—
ভয় পাই, মনে মনে, মানুষের ভিতরের সাধু
তাকে শয়তান করেছে। ভয় পাই, ভয়ংকর ভয়।

মাথার দিকের জানলা খোলা শুধু।
একটুকরো শহর—বাচ্চার ছাপছোপ লাগা মশারির মতো আকাশ জড়িয়ে
ভেসে আছে।
চারতলা থেকে নিচে দেখা যায় মানুষ, কুকুর, রথের মেলায় আনা ফুলগাছ
স্থির নার্শারির
সামনে, ঝুড়িতে। আর দেখা যায় উব্‌দো খাট, খাটিয়া এবং কড়ে রাঁড়ি—
ছিমছাম কালো কুঁজো, আপেল ন্যাসপাতি—এইসব।
সর্বদা কে কাঁদে! হাসপাতাল ঘিরে কাঁদে
কাঁদে শহরের কিছু ঘরে, কেউ কেউ—সবাই কাঁদে না
বহু লোক হাসে আর মেয়েমানুষের দল ঝাঁক বেঁধে ফুচকা খেতে যায়।
আমি একা এই ঘরে—সামনে করিডোর
ফিসফাস শব্দ শুনি, আলো জ্বেলে রাখি
অশরীরী ব'লে যদি কিছু থাকে, কাছাকাছি থাকে—
নিজেদের মধ্যে এতো কথাবার্তা সেরে, তার মানুষের ঘরে ভয় দেখাতে আসার
যথেষ্ট সময় নেই। ভূত বেশি হ'লে
মানুষ ভয়ের থেকে পরিত্রাণ পায়।
আমি তো পেয়েছি। পাবার কথাই নয়, তবুও পেয়েছি।
জানালার একটি কাচ ভাঙা ছিলো, তবুও পেয়েছি
যে-গেছে সে কষ্টে গেছে, ফিরে আসা আরো কষ্টকর!
হৃদয়ে জড়িয়ে আছে কিছু ঘাস-পাতা।
লেখার সময়ে যেন কালি লাগে

সমুদ্রের তীরে গেলে বালি লাগে
কাটাকাটি যেন থাকে, নির্বাচনে জেতেনি যে কিশোরের পদ্য তার
পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে রোগশয্যা থেকে লেখা চিঠি কোনো
প্রাজ্ঞ সাংবাদিকে—
তারই মধ্যে বুক দেখা রক্ত টানা। তৃষ্ণার খবর
কিছু টের পাওয়া যায় কিনা—প্রধান জিজ্ঞাসা নিয়ে
ডাক্তার দাঁড়ান। 'ভালোই আছেন। কোনো ভয় নেই'।
প্রকৃত কি ভয় নেই ? ভয় কারা করে ?
মৃতের মৃত্যুকে ভয় নেই জানি।
ঘরে যে রয়েছে, সে তো পেয়ে গেছে ঘর
কিন্তু, যে বাহিরে আছে ঘর খুঁজে-খুঁজে ঘোর রাতে
অপরের ঘরে দরজার সামনে অবিস্মরণীয় স্বপ্নে
শ্লথ নেশা, মূঢ়তার মৃগ হয়ে পাথরের মতো—
তার খুবই ভয়।
প্রকৃত পাথর হতে পারা খুব সহজে ঘটে না
কেউ কেউ পারে শুধু নুড়ি হতে, ইটকাঠ হতে
যার পিতৃপিতামহ গৌরবের প্রাসাদ ছিলেন
কিংবা কোনো পাহাড়ের বাম কি দক্ষিণ ভাগ
কেউ কেউ পারে তাই নুড়ি হতে, ইটকাঠ হতে
—ভয় এখানেও আছে।
এই রোগশয্যা ছেড়ে যেতে হবে নিশ্চয়, একদিন
তখন, কী হবে ?
সুনিশ্চিত যাবো। ভয় হবে।
যারা কোনোদিন কোনো রোগশয্যা থেকে উঠে আসেনি তাদের জন্যে ভয় !
কেন ভয় হবে ?
মানুষের যা থাকে, তা আমার খরচপাতি হয়ে গেছে কিছু ?
নাকি, আমি বেশি কিছু নিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখি
দাঁড়িয়েছি ?
মেদ নিয়ে, সুস্থ মাংস নিয়ে, নাকি নিষ্পলক চোখে
তার দিকে চেয়ে থেকে যে-দোষ করেছি তার ক্ষমা নেই !

ভয় করে। সামনে পিছনে ভয়। দক্ষিণে ও বামে ছায়া. তাই ভয়
ভয় চতুর্দিকে…
ভয় মৃত্যু নয়, ভয় পুরনো অসুখ, চাঁদ, ঘাসে বুকে-হাঁটা
কাঁটা যদি থাকে, সেই অলক্ষ্য কাঁটার মতো হেতুহীন ভয়
দাঁড়িয়ে ও বসে ভয়, দৌড়ে শুয়ে ভয়
ঐ ভয়ংকর ভয় ভয় সবখানে
ঐ ভয়ংকর ভয় ভয় সবখানে ॥

শিকড়-বাকড়

একটা বয়স ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিতো শিকড়,
জড়িয়ে যেতো লতায় পাতায় অধোবদন প্রেমে।
ঘাসের মতো ফুটে উঠতো কুঁড়ির যত ফুল,
একটা বয়স ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিতো শিকড়।

শিকড় ভালোবাসতো লবণ, পাতালে হিমঘুম
নখ-দখল মাটির ভিতর সূর্য কালোহিরে!
ঘুমের মাঝে স্বপ্ন যেন শিমুলতুলো ওড়ায়
বনের আর মনের, ছিলো শিকড় আধো-পোড়াই।

ঢেকে রাখাই সুসভ্যতা, ঢেকে রাখাই ভালো
সবার সেই ছোটোবেলার খেলাঘরের কালো,
ঢেকে রাখাই সুসভ্যতা, ঢেকে রাখাই ভালো।

যেমন একা একলা গাছ শিকড় ঢেকে রাখে

জন্মদিনের মঞ্চে মৃত

জন্মদিনের মঞ্চে মৃত মুখের পাশে ফুল

ধূপের ধোঁয়া, শুনেছিলাম, সইতে পারতে না
এখন সব অসহনীয় শীতলানদী পার

জন্মদিনের মঞ্চে মানুষ স্বভাবতই কাঁদে

ছেড়ে-যাবার উন্মাদনে মত্ত এসে পড়ে
আসার কথা ছিলো না মোটে, তবুও এসে পড়ে।
সবাই ঠিক ছাখে না, ছাখে কাছে-পিঠের লোক—
চমকে ওঠে, চোখ ফেরায়, অন্যমনে থাকে
শীতলানদী পারের লোক হাঁটুতে হাত রাখে

জন্মদিনের মঞ্চে কেন মৃতের পাশে ফুল ?

লজ্জায়-লজ্জায়

কেউ কি তোমার মতো দুঃখকষ্ট ছিঁড়ে
কাগজের মতো পথে ছড়িয়ে দিয়েছে ?
যেভাবে বাতাস পাতা ছড়ায় জঙ্গলে
সেভাবে কি কেউ গেছে সুঁড়িপথ ধরে—
একা একা ? সাবলীলভাবে ?

শুনেছি, হতাশ উট আত্মহত্যা করার তাড়সে
মাইল মাইল যায় রোদের আগুনে উড়ে-পুড়ে
বালিতে লুকোতে মুখ, শেষ করতে বেঁচে-বর্তে থাকা।

আর নয়, ভারি লজ্জা করে
আর নয়, পথের বন্ধন—
লজ্জা করে, ভারি লজ্জা করে
আর নয়।

কারণ তো নেই, কারণ তো নেই

লোকটা কীসের আক্রোশে তার শরীর ভাঙছে
পথের ওপর সপাট পড়ছে রাত্রিদুপুর
দুমড়ে যাচ্ছে হাতের কনুই হাঁটুর চাকি
ফাটছে মাথা, বুকের ছাতি কোন কারণে ?

লোকটা যেন পাগল, দেহের আগল খুলে
দাউ দাউ দাউ আগুন দেখায়, বজ্রপ্রপাত
এবং অস্থিসন্ধিতে তার রক্ত ঝরে
অস্থিমজ্জা পুড়ছে যেন গন্ধমাদন !

ঘর ভেঙে ঘর গড়ছে কোথায় ? গড়ছে কখন ?
তার কি হাতে সময় আছে নষ্ট হবার !
তার হাতে কি সময় আছে চুড়ায় যাবার ?
সময় আছে ? সময় কি তার শোউরোবাড়ি ?

লোকটা কীসের আক্রোশে তার চতুর্দিকের
ভাঙছে বেড়া, সুষম, খাড়া গেরস্থালি
ভাঙছে রোষে কোন আক্রোশে সুসম্পর্ক—
কারণ তো নেই, কারণ তো নেই, কারণ তো নেই !

'আমাকে দাও কোল'

'রাত্তুপুরের শ্মশানচিতা আমাকে দাও কোল—
বলতে-বলতে টলমলিয়ে লোকটি ঢুকে পড়লো
যেখানে শোক চাপা এবং মাপা কথার ভিড়ে
ফুলগুলি সব ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে মালায়
লোকটি দেখায় দুহাত তুলে শুকনো ডালপালা।

বলা যায় ?

খিড়কিপুকুরের মতো সমুদ্র পেয়েছি এবার গোপালপুরে।
বারান্দার নিচে শুরু তীর
কাঁকড়া তুলেছে কল্‌কা সারিবদ্ধভাবে।
মাখন-নরম বালি মাড়াতে-মাড়াতে ছোটে একপাল শিশু
সহসা জলের দিকে

নৌকা নেই
কাটামেরন নামানো যায়নি,
সমুদ্রের দানো-পাওয়া ঢেউ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে
ডাঙায়, মুখ থুবড়ে আছে তারই পাশে গর্তে-বসা মুখ
জেলেদের

আকাশে মেঘের কষ জমা হয়, ঝরে
জলে মেশে সেই কষ।
তরল পাথর ভাঙে ঝড়ে ও ঝঞ্ঝায়
কী তীব্র উন্মাদ বৃষ্টি, মেঘডাক, ফেনা···
আকাশ চাবুকে হলো ফালা ফালা, ভাঙনে চুরমার
নুলিয়াপাড়ায় আজ তিনদিন চুলোয়
আগুন পড়েনি।

অনভ্যস্ত হাতগুলি শুধুই বাড়ানো থাকে গলির আঁধারে···
কিছুমিছু চায়
কিন্তু, কথাই বলে না···
বলা যায় ?

আসছো কবে ?

রোরো নদীর ধার থেকে ঐ একটি বালক
কুড়িয়ে পেয়েছিলো রঙিন বুকের পালক
এবং একটি পাথর পেয়ে, সেই পালকে
জড়িয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলো এপার থেকে
পালক কি আর একাকিনী ওপার যাবে ?

যম-কালো এক মরদ ছিলো নদীর ওপার।
দেখাচ্ছিলো তার ভাগে লাল মোরগঝুঁটি,
বালক ছাখে, অনেকগুলি দাগ ও-ঝুঁটির—
তফাৎ কি আর অমনি হবে ?

কুড়িয়ে পেয়ে ছড়িয়ে দিলুম বুকের পালক
—আসছো কবে ? আসছো কবে ? আসছো কবে ?

কিসের কাজ, কেন ?

একটি কাঠ জড়িয়ে চলছিলো
একা একা, আকুল হয়ে লোক।
তাহার জন্যে ছিলো আমার শোক
শোকের মধ্যে ভাসতেছিলো কাঠ
ছিন্নভিন্ন স্মৃতির রাজ্যপাট

আলতাপাড় জড়িয়ে শাদা থানে
আমায় যেতে হলোই অন্যখানে
নিয়তি বড় নিঠুর, কেড়ে নিলো
কাঠ জড়িয়ে লোকটিকে চলে গেলো।
—এখানে কাজ শেষ হয়েছে বুঝি!
কিসের কাজ? কেন বা এসেছিলো?

জানে, ভেঙে দিলে তবে গড়া হয়

খিড়কিপুকুরের মতো সমুদ্র ফেঁদেছি একটি বাড়ির ছায়ায়
সিঁড়ি, বালি, ইটকাঠ, মজা কুয়ো পার হয়ে কুচোনো ঝিনুকে
পা কেটে সমুদ্রতীরে পৌঁছে বসে থাকা।
উপর্যুপর দেখা, বাতাসের চড় খেয়ে ফেনার ফোঁসানি
আর কোনো কাজ নয়, চোখের ভিতরে টানো নীল উপদ্রব,
ফুসফুসে আঁশটে গন্ধ, গায়ে নুন, প্রসাধন সারো,
চিৎ হয়ে শুয়ে থাকো ফেনার উপরে
চিৎ হয়ে শুয়ে থাকো বালির উপরে
আর কোনো কাজ নয়, চোখের ভিতরে টানো নীল উপদ্রব
কোনো কাজ নয়, কাজ এখানে হবে না।

মনে হয়, দূরে আছে ইউক্যালিপ বন
বাতাসের তাড়া খেয়ে শুকনো পাতা বালির উপরে স্তাখো
ছড়িয়ে রয়েছে।
ওগুলিই দুঃস্থ আর হাস্যকর নৌকো হয়ে ভোরে ভাসে জলে
ভাসায় স্থলিয়াভাগ্য কাটামেরনের কোলে ছেঁড়াখোঁড়া রুপো,
বাতাসে কার্পণ্য নেই, কার্পণ্য কেবল দুধেভাতে
নুনভাত খাবে বলে কালো শিশু পা ছড়িয়ে কাঁদে
চুল বাঁধে ফুল গোঁজে, পা ছড়িয়ে কাঁদে
ভাতের বদলে ঢোকে সর্বনেশে বালি

গালের গহ্বর বোজে, কাঁকড়ার যেমন
তীর ফুটো-করা গর্ত বুজে যায় ফেনায়, স্ফটিকে ।

মনে হয়, শতাব্দীর ভগ্নস্তূপ তুচ্ছ করে ইস্পাত-কঠোর
বাড়িটির রং-বর্ণ এখানে টেনেছে।
চতুর্দিকে ভাঙা, ভাঙা, দুঃসহ ভাঙন···
নড়বড়ে দাঁতের মতো জানলা ঝুলে আছে
হলুদ মরচে-পড়া কবজা খসায় মেহগিনি—
শাল-সেগুনের মাংসে পূর্ণ ভোজসভা
এখানে, গোপালপুরে, সারে ঘুণপোকা !
শাদা ফকফকে খুলি, হাড় ইতস্তত
পড়ে আছে, মনে হয়, একদা রাতের নিশ্চিন্ত সংসার, ঘুম
তছনছ করেছে
ঝড়-ঝঞ্ঝা, সমুদ্রের নীলের ঈশ্বর
জানে, ভেঙে দিলে তবে গড়া হয় সুস্থ, বিধিমতো ॥

জঙ্গলে যাবার

জঙ্গলে যাবার কোনো দিনক্ষণ নির্ধারিত নেই,
যে-কোনো সময়ে তুমি জঙ্গলের মধ্যে যেতে পারো।
পাতা কুড়োতেই যাও, কিংবা দিতে কুঠারের ঘা,
জঙ্গলে যাবার জন্যে অকৃপণ নিমন্ত্রণ আছে।
জঙ্গলে চাঁদের সঙ্গে হেঁটে গেছো কখনো জ্যোৎস্নায় ?
পাতার করাতে চাঁদ ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছো কি ?
ফুটবলের মতো চাঁদ পড়ে আছে টিলার উপরে—
কখন, গভীর রাতে খেলা হবে, জয়োল্লাস হবে—
এসব মুহূর্তে তুমি জঙ্গলের মধ্যে যেতে পারো ॥

জঙ্গলের মধ্যে ঘর ঈশ্বর গড়েন

বৃষ্টিতে ডুয়ারস খুবই পর্যটনময়।
মেহগনি-বীথি পার হলে পাবে দোতলা বাংলোটি
কাঁটাতার বেড়া-ঘেরা সবুজ চাদরে ঘাস বড়ো উচ্ছৃঙ্খল
এখন, এখানে।
তাকে ঘিরে আছে কিছু রুদ্রাক্ষের গাছ ছাতার মতন
কৃষ্ণের দেহের বর্ণময় ফল পড়ে আছে ঘাসে,
রাতের বাদুড় তার মুখ থেকে খসিয়ে গিয়েছে,
বৃষ্টিপতনের চাপে হয়তো বা। খুঁটিমারি রেনজ
দোতলা বাংলোর ঘর আমাদের দখলে দিয়েছে
দু'রাতের জন্যে।

জঙ্গলের মধ্যে ঘর ঈশ্বর গড়েন।
মানুষের বসবাস সহজ সহজতর হবে ব'লে
ঈশ্বর গড়েন
জঙ্গলের মধ্যে ঘর—শিক্ষানবিশির জন্যে
ঈশ্বর গড়েন
মানুষেও পারে
অনভ্যস্ত মানুষের অভ্যাসের জন্যে আজ
মানুষেও পারে
ঈশ্বরের কাজ হাতে, উত্তরসূরির মতো, নিয়ে নিতে
এবং বাড়াতে,
দুঃখ ও সুখের মধ্যে থাকবে ব'লে, মানুষেই পারে।

এখন জঙ্গল খুব উপদ্রুত নয়।
মানুষের ভয়ে সব পশুপাখি
অধিক অধিকতর জঙ্গলের দিকে সরে গেছে।
মানুষের সাধ্য নয় সে গভীরে যাওয়া
প্রাণভয়, কুশলতা অপেক্ষাও বড়

ওরা গেছে প্রাণভয়ে নিজেকে জেতাতে নয়, বাঁচার তাগিদে
মানুষের মতো নয়, শিকারীর মতো নয় কোনো।

খুঁটিমারি বাংলো জুড়ে বসে থেকে অবাক হয়েছি!
তেমন নিষিদ্ধ কোনো পাখি নয়, কাক ও শালিখ—
যাদের গৃহস্থ বলে মোটামুটি, তারাই এসেছে
কখনো রেলিং-এ বসে খাদ্যের গন্ধের দিকে
পলক ফেলেছে,
কখনো উঠোনে খুঁটে তুলেছে কেঁচো বা কীট—নিজস্ব তাদের
মানুষের মুখাপেক্ষী থেকে এক উদাসীনতায়
তাদের ফুসফুস ভরে গেছে, শুধু মনটি ভরেনি
মন ও খাদ্যের মধ্যে অপরূপ যোগাযোগ আছে,
আমি জানি।

ছেড়ে চলো খুঁটিমারি, মেহগনি-রুদ্রাক্ষের বন।
খাট ও পালঙ্ক, কাচ-ক্রকারিজ, চিরুনির চুল
ছেড়ে চলো সুবাতাস, সোঁদা গন্ধ, কাদা মাটিময়
জঙ্গল, যা পাখিহীন, পশুশূন্য, ছেড়ে চলো তাকে
এভাবেই যেতে হয়, যা তোমাকে পরিত্যাগ করে
তাকে ছেড়ে।
স্মৃতি বেদনার মালা ছিঁড়ে ফেলে, বাগানে ছড়িয়ে
এভাবেই যেতে হয় দ'লে মলে অন্ধের মতন।

এবার জঙ্গলে সরাসরি নয়, পথ খুঁড়ে খুঁড়ে
দুপাশে জঙ্গল রেখে ক্রমাগত ছুটে-দৌড়ে যাওয়া
জঙ্গলের মায়া মেখে, ছায়া মেখে উত্তরের দিকে
ক্রমাগত চলে যাওয়া, পিছনে বলেও যাওয়া নয়
শুধু যাওয়া, শুধু চলে যাওয়া।
এবার জঙ্গলে সরাসরি নয়, মেটেলির হাটে
জঙ্গলের কিছু কিছু লোক ছুঁতে যাওয়া।

মেটেলির-চালসার হাটে চলো যাই
ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে
পাহাড় পাকিয়ে উঠে চলো পথ ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে।

কাছে দূরে চা বাগান, ধোঁয়া ওঠে পাকিয়ে আকাশে
এখানেও পাকদণ্ডী ! ধোঁয়ার প্রকৃত পাকা পথ
উত্তর বাংলার।
এ-নিসর্গ দ্বিতীয়রহিত
জঙ্গল-পাহাড়-নদী মানুষের মুখশ্রী বাড়ায়
ছায়া ফেলে মুখে।
মানুষ এখানে খুব দ্রুতগামী নয়
মাটির মানুষ নয় খরস্রোতা নদীর মতন
কিংবা শুধু পাহাড়ের মতো নয় সম্পন্ন সবুজে
বিপন্নতা আছে, ধুতি, বৃক্ষ, পাতা আছে—
শুধু হাহাকার নয়, আনন্দও আছে,
মাদলে-বাদলে বাজে হাতের খঞ্জনী,
পায়ের নূপুর বাজে জলে যেন নুড়ি
ঘোরা গান গেয়ে চলে মহামান্য বুড়ি
তিস্তা।

চাতালে বসেছে হাট। দেখে মনে হবে
শর্করা মণ্ডের পানে ছুটেছে মানুষ
সারিবদ্ধ, পিঁপড়ের মতন
বাগানে বল্মীকস্তূপ ভেঙে-ভেঙে ছুটেছে বাল্মীকি
হাটে যাবে !
সপ্তাহের হাট,
ছ'দিনের ধান ভেঙে চাল করা আলোর মতন
এই হাট !
ছ'দিনের ধান ভেঙে কায়ক্লেশে ভাতের মতন
এই হাট !

বন্দীর জানলার মতো হাতছানিময়
খোলা খাঁচা নিয়ে পাখি যেমন বিমূঢ়
মানুষও বিমূঢ় হয় ছ'-ছ'দিন ভেবে
অতোটুকু মুক্তি পেলে, কীভাবে সামলাবে ?

একসময় সন্ধ্যা নেমে আসে
মাদলে স্খলিত কাঠি ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে আকাশে-বাতাসে
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
বিজয়ী মোরগ বুকে ওঁরাও মরদ হাসে যতো
তারও বেশি কাঁদে
কারণ না জেনে কাঁদে ধুলোয় লুটিয়ে
ছ'দিনের কান্না যেন একদিনে ফুরোবে
হালকা-বুকে ফিরে যাবে বাগিচা-বস্তিতে—
যাওয়া যায় ?
বাগিচার মধ্যে বস্তি ঈশ্বরই গড়েন ॥

পরিত্রাণ চাই

ও হিরণ্যগর্ভ, আমি পরিত্রাণ চাই—
যা কিছু নিজের, আমি ফেলেই এসেছি
ও হিরণ্যগর্ভ, আমি পরিত্রাণ চাই

সুখে-দুঃখে থাক ওই সবুজ কল্যাণ
মৃতের ভিতরে মরে থাকে দুইজনা
বেঁচে মরে বৃষ্টি হয়ে যাক সাধারণ
ও হিরণ্যগর্ভ, আমি পরিত্রাণ চাই ॥

ও অবিচল

ইচ্ছে করে মনের মধ্যে তোমার মৃতদেহ পোড়াই
ইচ্ছে করে যখন নীলে ঐ পুরনো আকাশ জোড়াই
যেন মনের বনের মধ্যে তোমার মৃতদেহ পোড়াই
নীল না পেলে পাবো সবুজ, ও অবিচল, তোমাকে ঠিক
পাবো আমার হাতের মধ্যে।
ঐখানে যে সাতমহলা ছিলো প্রাসাদ
একসময়ে হতো তো সাধ
তার ভিতরে
প্রবেশ করা এবং দখলদারি নেওয়া সিংহগড়ের···
আজ পড়ে তার আধভাঙা ইট

তোমায়-ভরা স্মৃতির পাথর আজকে পোড়াই
ইচ্ছে করে লাটাই হাতে যেমন-তেমন ঘুড়ি ওড়াই
ঘর না পেলে পাবো আকাশ, ও অবিচল, তোমাকে ঠিক
পাবো আমার হাতের মধ্যে।

বিবাহ ও বিসর্জন

সুন্দরের আয়তন জেনেছে সুন্দর-ই
কেউ নেই যে আমাকে বেঁধে রাখতে পারে
বেঁধে রেখে মারতে পারে, মেরে ফেলতে পারে
সুন্দরের আয়তন জেনেছে সুন্দর-ই !
সুন্দর কোথায় ? তুমি কথা কও, বিবাহও চাও।
নতুবা, খালের জলে ভেসে যাও গর্ভিণী মেথর
রূপোপজীবিনী নয়, তুমি নও ততো ক্ষুৎকাতর

পারিবেশ-পরিজন ভালোবাসা, কিন্তু কে না বাসে—
সুন্দর কোথায় ? তুমি কথা কও, বিবাহও চাও
ভেবে দেখো চিরকাল—বিবাহ ও বিসর্জন আছে।

তুমি আছো, সেইভাবে আছো

[দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে]

ভালোবাসা ভেবেছিলো, তোমাকে অর্পণ করে তার
যা আছে সবটুকু দিয়ে, ছুটি নেবে, বিদায় জানাবে…
বিচারসাপেক্ষ এই জনে-জনে বেঁটে দেওয়া থেকে
এবার নিষ্কৃতি নেবে, ভালোবাসা ভেবেছিলো এই
কিন্তু তুমি ছুটি নিয়ে গেলে…
স্মৃতির স্থগিত রূপ রেখে গেলে চোখের সুমুখে
বুকের ভিতরে রেখে গেলে নিষ্ঠাবান মাতৃমুখ
করস্পর্শ রেখে গেলে শোকদুঃখ থেকে তুলে নিতে,
বন্ধু ও শিশুর মতো কতোকাল তোমার প্রশ্রয়
পেয়েছি, তা, আমি জানি, আর জানি কখনো পাবো না।
পিছনে দেবদারু গাছ, তার ছায়ার বিকেলে
প্রেসিডেনসি কলেজের সেই গ্রোন, ঊর্ধ্বগামী সিঁড়ি
বরফখণ্ডের রোদ বারান্দার এখানে-সেখানে
পড়ে আছে, তুমি নেই…
কোনোদিন ছিলে না এমন, ছিলে নাকি ?
স্বভাব ছিলো না কিছু আগে আসা, সময়ের আগে ?
সময়ের বেশ কিছু আগে এসেছিলে বলে আফশোস করোনি,
এতো স্বাভাবিকভাবে তুমি সব মেনে নিয়েছিলে
আমরা পারিনি, তাই, মাঝেমধ্যে বেঁকেচুরে গেছি…
সাদর আঙুল তুলে তুমি সাবধান করে দিতে, মনে আছে ?
তোমার মন তো ভালো, কারো মন্দ কখনো ভাখোনি
নিজেকে বিপন্ন করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছো

দীর্ঘ ও সহাস্য হাত অসুখের রেখেছো কপালে
কতোবার, আরোগ্যের মধ্যে ছিলো তোমার করুণা।
করুণাই বলি একে, বিশ্বাসভাজন ভালোবাসা
কিংবা, তারও চেয়ে কিছু বেশি এই নিষ্পলক আলো
অন্ধকার গলি থেকে বহুবার সড়কে এনেছে
আমাদের।

বন্ধু, সুখে থেকো আর মনে রেখো দেবদারুচ্ছায়ে
কিছু কিছু লতাগুল্ম, ছোট গাছপালা—তার কথা,
তোমার মন তো ভালো, মনে রেখো, পরিত্রাণ করো
প্রকৃত সংকট থেকে, ভালোবাসাহীনতার থেকে
ক্ষমা করো, শেষ দৃশ্যে আমি যেতে কিছুতে পারিনি
যাতে, মনে হতে পারে, তুমি আছো, সেইভাবে আছো,
যেভাবে আগেও ছিলে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে
কাছাকাছি।

মনে হয়, কিছুই দেবে না

কখনো দেখিনি তাকে, কিন্তু তার মুখময় পরিত্রাণ
লেখা হয়ে আছে
পথের ধুলোতে তীব্র হয়েছে ও-মুখ
অর্জুনের ছায়া-ফেলা সংশ্লিষ্ট অসুখ
তাকে বন্দী করে
মনে হয় সুখী হবে ঝড়ে
বৃষ্টিতেও কিছুটা স্বাধীন
সম্ভ্রান্ত পোশাক ছেড়ে কাছাকাছি থাকবে কিছুদিন।
আমন্ত্রণ করে নিতে এসেছিল, একাকীও নয়
সঙ্গে ছিলো সামাজিক শান্ত বরাভয়
হঠাৎ দাঁড়ালো—'চোখ গেলো'

আকাশেও মেঘ
কিছুকাল ছিলো নদীবেগ
আকাশেও মেঘ
কিছুকাল ছিলো নদীবেগ।
কোথাও দেখিনি আমি দোপাটির ছায়ায় রয়েছে
কেঁচোর স্মারক-স্তম্ভ
কোনোদিন কাউকে দেখেছো নিরঙ্কুশ, অনুভূতিপ্রিয়
বাংলোর পিছনে এক সমুদ্র রয়েছে
পুঁইমাচাটির—
কী নীল উদ্ধত নীল সমুদ্রের কাছে—
নদী পড়ে আছে
পেপেগাছটির মধু এতো কি সুদূর।

আবার তোমাকে দেখা, সেগুন-মঞ্জরী,
তুমি কিছু কথা দেবে ?
কালকে জানাবে ?
—ভালোবাসো কিনা ?
মনে হয়, কিছুই দেবে না।

বেঁচে আছি

খানাখন্দ ভেতরে না হোক
আছে
তাই তো তারই কাছে
ঝুড়িভর্তি পাথর আনতে ছুটি
সে সঙ্গে একমুঠি
অন্ন
কৃপা করো—সবার জন্য

কিছু না থাক শ্মশানের জন্য দরজাটাই খোলা
ধানের গোলা
ছাই
দিগন্তে বাজখাঁই
চাঁদের আলো
ভালো-
না বাসার অর্থ- কাঠিন্য
সবার জন্য
শ্মশানের দরজাটাই খোলা
ধানের গোলা
ছাই
দিগন্তে বাজখাঁই
চাঁদের আলো
ভালো
ওটুকুর জন্যেই বেঁচে আছি ॥

প্রচ্ছন্ন প্রদেশ

সিন্দুকের ডালা খোলা, তার মধ্যে রাজরাজেশ্বর
মোহর,
আমার ক্ষুধা একমুঠো ভাতের !
প্রয়োজন ছিল নদী, ঠেকেছি পাথরে,
সুখের কাপাস আনতে খোঁচাই কাতরে.
স্বাভাবিক ॥

যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো ?

ভাবছি ; ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

এত কালো মেখেছি দু হাতে
এত কাল ধরে
কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি।

এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোন দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো ?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না-অসময়ে।

বিড়াল

সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুস্থ বিড়াল
পশমের অন্তর্গত হয়ে আছে অসুস্থ বিড়াল
খুব কাছে বসে আছে হিতব্রতী অসুস্থ বিড়াল
কাছে বসে আছে কিছু পাবে ব'লে, অমরতা পাবে।
কাছে পেয়ে রাখা শক্ত, ঢাকা শক্ত চাদরে কাঁথায়
ঢাকা শক্ত ঘরে বাইরে, ঢাকা শক্ত অসুখে-সম্মোহে
সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুখী বিড়াল।

বলো, ভালোবাসো

এই হাসপাতালে এসে দেখি শুধু আমার অসুখ।
আর সবাই সুস্থ, প্রাণবন্ত, শুধু করিডোরে হাঁটে—
এদিক-ওদিক যায়, জানলায় দাঁড়ায়, পাখি ছাখে,
পাখিদের সঙ্গে কিছু কথা বলে, খবরকাগজ
এখানে আসে না।
কে আর তোয়াক্কা করে খবরের, তেলের দরের ?
এখানে সোনার চেয়ে দামি কিছু নীরোগ মানুষ !
আমার অসুখ, একা আমিই অসুখী তাই আছি
বিছানায় শুয়ে আছি, বসে আছি, দাঁড়িয়ে রয়েছি
আয়নার সম্মুখে, তুমি আমার ভিতরে কথা বলো
ভূতপ্রেত যাই হও আমার ভিতরে কথা বলো
ভালোবাসা কথা বলো, হোক না সে ছুঁচের মতন
নিষ্ঠুর, দ্ব্যর্থ কথা, কথা বলো আমার ভিতরে
বৃষ্টির মতন কথা, বিদ্যুতের, শিকড়ের কথা,
বলো, ভালো আছো আর তোমার অসুখ সেরে গেছে
বলো, ভালোবাসো তাই তোমার অসুখ সেরে গেছে ॥

পুরনো নতুন দুঃখ

যে-দুঃখ পুরনো, তাকে কাছে এসে বসতে বলি আজ
আমি বসে আছি, আছে ছায়া, তার পাশে যদি দুঃখ এসে বসে
বেশ লাগে, মনে হয়, নতুন দুঃখকে বলি যাও
কিছুদিন ঘুরে এসো অন্য কোনো সুখের বাগানে
নষ্ট করো কিছু ফুল, জ্বালাও সবুজ পাতা, তছনছ করো
কিছুদিন ঘুরে দুঃখ ক্লান্ত হও, এসো তারপর
পাশে বসো।
এখন পুরনো এই দুঃখকে বসার জায়গা দাও
অনেক বাগান ঘুরে, মানুষের বাড়ি ঘুরে, উড়িয়ে-পুড়িয়ে
ও আমার কাছে এসে বসতে চায়। কিছুদিন থাক।
শান্তি পাক, সঙ্গ পাক। এসো তারপর।

ও নতুন দুঃখ তুমি এসো তারপর॥

সুদর্শন পোকা

ধুলোতে ওই ঘূর্ণী, ঘোরো সুদর্শন পোকা
দূরের চিঠি কাছে আনাও সুদর্শন পোকা
শুভ খবর কাছে আনাও, দাবার চালে দোলা বানাও
হা পিত্যেশ নোলা বানাও সুদর্শন পোকা।
আঙুলে চেলে গণ্ডী করি সুদর্শন পোকা
নিখাকি হাতে গড় করেছি সুদর্শন পোকা
ধুলোর ঘর ভাঙো তুখোড় সুদর্শন পোকা
বেরিয়ে এসো, মন্দ বেশে—সুদর্শন পোকা!

তামাভরণ যেটুকু ছিল স্যাকরাবাড়ি গ্যালো
চার খেজুর গাছের রস মোল্লাবাড়ি পেলো
পরার কানি হাতের পাণি, মরার কাঠ কই ?
ছেলে-পুলের বুক না তো ও, ডোঙার ওপর ছই !
লোকটা আছে, না ফুঁকে গ্যাছে—দিওনা—মোকে ধোঁকা
আজ না দিলি, কাল ক'রো না—সুদর্শন পোকা ॥

সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা

যুদ্ধে যেতে হয়নি, তবু গায়ের ক্ষতচিহ্নে
লোকটা মধ্যযুগের যোদ্ধা—সঠিক মনে হবে
তরবারির খর আঘাত কোনখানে পড়েনি ?
একটি চোখ রক্ত-ঢেঁড়শ, চলচ্ছক্তিহীনও

লোকটা যদি পাগল হতো, বাতিল করা যেতো
পাগলও নয়, ছাগলও নয়, অভিসন্ধিমূলক
সে দোষে দোষী নয়, বরং পরের উপকারী
স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনচেতা, মন্তপায়ী, ভেতো !

অসুখ এক উদাসীনতা, অথচ সামাজিক
লোকটা কিছু রহস্যময়, লোকটা কিছু কালো
নিজের ভালো করেনি, তাই, অন্তে ক'রে ভালো
সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা কিছুটা নির্ভীকই।

শাক্য

তন্ময়তার মধ্যে একটি গোলা-পায়রার ছানা
মুখ থুবড়ে পড়লো কোলের উপর
ধরবো বলে দুহাত এবং চারহাত বাড়িয়ে দিলাম
বাতাস হাতড়ে ফিরলো দুহাত শূন্য কোলের উপর
বাঁচাতে পারলোনা, শাক্য, গোলা-পায়রার ছানা
কপিলবাস্তু ছাড়লো না এই নতুন রাজার ছেলে
শাক্য হয়েই রইলো এবং গোলা-পায়রার ছানা
বেড়াল মুখে কামড়ে নিয়ে চললো অন্ধকারে…

যদি পারো দুঃখ দাও

যদি পারো দুঃখ দাও, আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি
দাও দুঃখ, দুঃখ দাও—আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি।
তুমি সুখ নিয়ে থাকো, সুখে থাকো, দরজা হাট খোলা।

আকাশের নিচে, ঘরে, শিমুলের সোহাগে স্তম্ভিত
আমি পদপ্রান্ত থেকে সেই তপ্ত নিরীক্ষণ করি।
যেভাবে বৃক্ষের নিচে দাঁড়ায় পথিক, সেইভাবে

একা একা দেখি ওই সুন্দরের সংশ্লিষ্ট পতাকা।

ভালো হোক মন্দ হোক যায় মেঘ আকাশে ছড়িয়ে
আমাকে জড়িয়ে ধরে হাওয়া তার বন্ধনে বাহুর।
বুকে রাখে, মুখে রাখে—না রাখিও সুখে প্রিয়সখি!

যদি পারো দুঃখ দাও আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি
দাও দুঃখ, দুঃখ দাও—আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি।
ভালোবাসি ফুলে কাঁটা, ভালোবাসি, ভুলে মনস্তাপ—
ভালোবাসি শুধু কূলে বসে থাকা পাথরের মতো
নদীতে অনেক জল, ভালোবাসা, নম্রনীল জল—
ভয় করে॥'

ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো

ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠোনের কোণে।
ছায়া ছিলো, মায়া ছিলো, মুথা ঘাস ছিলো
ছাচতলায় আর ছিলো বৃষ্টিকতগুলি…
ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠোনের কোণে
কিন্তু সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি
কেউ, ধীর পায়ে এসে, ত্রস্ত একা একা

কেউ সে পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি
গভীর গভীরতর রাত হয়ে এলো

কেউ সে-পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি

গভীর গভীরতর রাত শেষ হলো

কেউ সে-পিঁড়িতে এসে এখনো বসেনি।

এপিটাফ

কিছুকাল সুখ ভোগ করে হলো মানুষের মতো
মৃত্যু ওর, কবি ছিল, লোকটা কাঙালও ছিল খুব।
মারা গেলে মহোৎসব করেছিল প্রকাশকগণ,
কেননা, লোকটা গেছে, বাঁচা গেছে, বিরক্ত করবে না
সন্ধ্যেবেলা সেজে-গুজে এসে বলবে না, টাকা দাও
নতুবা ভাঙ-চুর হবে, ধ্বংস হবে মহাফেজখানা
চট্‌জলদি টাকা দাও, নয়তো আগুন দেবো ঘরে

অথচ আগুনে পুড়ে গেল লোকটা—কবি ও কাঙাল!

সমূহে একা রেখা

বর্ণনাতে বিশদ হলেও রহস্য কি ঘোচে?
পদ্মপাতার উপরে জল, চোখের তল মোছে।
এভাবে তার চিবুক রাঙা, ভাঙা কলসখানি।
একদা ছিল সাদর কাঁখে, সেকথা আমি জানি
আমার হাতে একদা ছিল কবুতরের স্তব।
অবয়বের বাহিরে ছিল অচেনা অবয়ব,
যামিনী রায়ের আঁকা নয়ান
বুকে আমার দিয়েছে টান
অনুভবের ভিতরে মাথা আরেক অনুভব
আমার হাতে একদা ছিল কবুতরের স্তব।

ঠোঁটে আমার একদা ছিল জোঁকের পরমায়ু।
বনের আর মনের মাঝে জটিল হলো বায়ু,
দু'হাতে দুই করতাল
বাজের স্বরে বেজেছে কাল,

প্রীতশয়ান কেবল আজ শিথিল করে স্নায়ু।
ঠোঁটে আমার একদা ছিল জোঁকের পরমায়ু।

বরং রেখা, সমূহে একা, ফুটিয়ে তোলো তাকে।
বর্ণনার মতো বিশদ বেঁধোনা সাত পাকে,
অন্ধকারে করো নিবিড়
একা থেকেও ঘোচে না ভিড়
ফুলমালার মতন বক আকাশে উড়ে থাকে।
বরং রেখা, সমূহে একা, ফুটিয়ে তোলো তাকে।

সুখে থেকো পিতরো!

ভিতরে বারান্দা ছিল, বয়েসে ভেঙেছে।
খসেছে প্লাস্টার, হাড় ইটের মতন
ভাঙছে, ভেঙে গেছে নোনা কামঠ-কামড়ে,
বিতিকিচ্ছিরি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে,
সুগঠিত মাড়ি গলা-রবারের মত
রয়েছে কেলিয়ে, জিব ফুটিফাটা, লোল!
মানুষটি সুন্দর ছিল, অন্ধেও কবে না
আজ, এতদিন পর!

ছিল মাল্যবান, সুখী, চন্দনচর্চিত
শুভবিবাহিত ছিল, প্রেমে ছিল আঠা!
আজ বৃষ্টিহীন বাদা পাখিতে ভরেছে,
বেশরম ঢোলকলমি বেড়ায় লটকানো,
রগের উদ্‌গত শিরা তরুলতা, আর
একটি কিশোর-স্পর্শ মেঝের পেরেকে…
সুখে থেকো, পিতরো!

বিরহে যদি দাঁড়িয়ে ওঠো

আসলে কেউ বড় হয় না, বড়র মতো দেখায়।
নকলে আর আসলে তাকে বড়র মতো দেখায়,
গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে কতো ছোটো
সোনার তাল তাঙড়ে ধরে পেয়েছো ধূলিমুঠো।
ভালোবাসার দিঘিতে কতো করেছো অবগাহন,
পেয়েছো সুখ দুঃখ আর ছলে ভোলানো দাহ।
পুড়েছো বনে মালার মতো, যাওনি তবু ছেড়ে,
যতক্ষণ স্মৃতি-আড়াল নিয়েছে তাকে কেড়ে।
আসলে তুমি ক্ষুদ্র ছোট, ফুলের মতো বাগানে কোটো—
বিরহে যদি দাঁড়িয়ে ওঠো, ভূতের মতো দেখায়!
গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে কতো ছোটো।

এই উজ্জ্বলতা অল্প

পৃথিবীর পক্ষে এই উজ্জ্বলতা অল্প মনে হয়—
মনে হয় সৃষ্টিছাড়া উল্লাসের সমগ্রতা নিয়ে
টান পড়বে মারাত্মক
পৃথিবীর পক্ষে এই উজ্জ্বলতা অল্প মনে হয়
ঘরের রোদ্দুর কোনো ঘর থেকে বেরুতে পারে না
পারে না বলেই যায় তোরঙ্গের ভিতরে শোয়াতে
নিজেকে, কাপড়ে, ভাঁজে, ন্যাপথাল গুলির মতন
এদিক-ওদিক কয়ে তোরঙ্গে পৃথিবী গড়ে নিয়ে
সুখে থাকে, বড়ো ঐ পৃথিবীর গায়ে লেগে থাকে।

যেখানে দাঁড়াই, ভুল

যেখানে দাঁড়াই, দেখি, ভুল দাঁড়িয়েছি!

শিশুকাল থেকে এই দাঁড়ানোর জন্যে করে ত্রস্ত হাঁকুপাঁকু
কেমন দাঁড়াতে শেখা ঐ মঞ্চে, ডুবোঘরে, মাঠে—
মানুষের পাশাপাশি, মানুষের দূরত্বে ও কাছে,
কেমন দাঁড়াতে শেখা সরীসৃপ, লতার মতন!
দুঃখ? দুঃখবোধ নিয়ে বিলাস করেন গল্পে রাজা
ধনকুবেরের দুঃখে কাঁদে দেশ, দিল্লির কোকিল—
কাক নয়, পক্ষী নয় আর কাঁদে ব্রাহ্মণ শকুনি।

যেখানে দাঁড়াই, দেখি, ভুল দাঁড়িয়েছি।

মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার

মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার আজ
বেরিয়ে পড়েছে পথে, এক অংশ ঢুকেছে জঙ্গলে
বাদুড়ের মতো ঝুলে রয়েছে গাছের ডালে ডালে
কিছুটা আঁধার গেছে মিশে ঐ সবুজ পাতায়।
পাতাকুড়ানিরা কিছু অন্ধকার ঝুড়িতে রেখেছে
শুকনো পাতার সঙ্গে, কুচো কাঠ তাদের সঙ্গেও
মিলেমিশে আছে, ভুল আগুনে পুড়বে বলে আছে
ভিক্ষে-করা ভাত হবে বলে ওরা মিলেমিশে আছে
মানুষের মধ্যে নেই মিলেমিশে থাকার সভ্যতা
জন্তুদের মধ্যে আছে মিলেমিশে থাকার সভ্যতা
মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার আজ
বেরিয়ে পড়েছে পথে, ইঁদুর ছুঁচোর মতো পথে।

দুঃখের অখণ্ড চাপ

দুঃখের অখণ্ড চাপ, দুঃখতেই আছে।
সুখে বা সন্ত্রাসে নেই, দ্যোতনায় নেই—
দুঃখের অখণ্ড চাপ, দুঃখতেই আছে।
মর্মতলে পড়ে আছে ছায়া ও রোদ্দুর
মেঘ এসে পড়ে থাকে কুকুরকুণ্ডলী
তাড়ালে যায় না, শুধু রাত্রে ভেসে যায়।
দুঃখের অখণ্ড চাপ, দুঃখতেই আছে।

বাগানের কেউ নয় নষ্ট ফল

নষ্ট কিছু ফল পড়ে মাটিতে গড়ায়।
নিজে নয়, নিজে ও তো গড়াতে পারে না।
কিছু পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যায় ওকে খন্দে ফেলে দিতে—
ফেলে দেয়, ও কিছু বলে না।

বলার উপায় নেই, ওর শুধু নষ্ট চেয়ে থাকা,
চেয়ে-চেয়ে কিছু বলা, নষ্ট কিছু বলা।
ফলের বদলে ঐ খন্দ কথা বলে!
জল আছে, জল কিছু বলে—
কাদা আছে, কাদা কিছু বলে!

নষ্ট কিছু ফল পড়ে মাটিতে গড়ায়—
দুর্ভাগার দিনকাল শেষ, তাই মাটিতে গড়ায়,
কিছু পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যায় ওকে খন্দে ফেলে দিতে—
বাগানের কেউ নয় নষ্ট ফল, একদিনই ছিলো॥

আপন ছবি

আজ থেকে দু দশক বাদে আমায় নিয়ে হুলুস্থুলুস
করবে না কেউ, দেখতে পেলুম, ছবির গলায় গন্ধমালা।
রঙ-মাখা আলেখ্যে ফোটে সেই সেদিনের বুকের জ্বালা!
চাওয়া পাওয়ার মধ্যে ছিলো কী বিঘ্ন, কী বিষণ্ণতা
আজ এই প্রেক্ষাঘরের ভিতর শান্তি, শান্তি—প্রহার করে
প্রহার করে রুগ্ন লেখা, শেখায় মহান মূর্খ ছিলে—
তা নইলে ঐ কানাকড়ির কী দাম দিলো এ-সম্মেলন ?
কেউ বলেছে, বাঁচার মতো বাঁচতে পারতো লোকটা, যদি
থামতে পারতো গলির মোড়ে, সড়ক অবদি যাওয়া কি ঠিক ?
সতর্কতা শিক্ষণীয়ই, না হলে হয় অপঘাতে
মৃত্যু, মৃত্যু, সকালপ্রয়াণ। বেশ কিছুকাল বাঁচতে পারতো॥

যাবার সময়

শামপানে ফেড়েছে, ও কে কলকাতার গলি ?

গলিভর্তি কালো জল, শক্ত যেন সিংভূমের মাটি
মাটি ঠিক নয়, কষ্টিপাথরের বুক ভরে জল···
পড়ে শাদা পৈতে কোনো ব্রাহ্মণের কাঁধ থেকে নিচে

আকাশের দিকে চোখ তোলো, দেখবে কাঁধের উপরে
দু'চোখের সর্বনাশ মুছে বাঘ দাঁড়িয়ে রয়েছে।
কী বিস্ময় সেই চোখে, হিংসা নয়, বিমূঢ় বিস্ময়···
সুন্দর মানুষ কিছু খেলা করে প্রপাতে, প্রত্যয়ে

প্রপাতে পাথর আছে, ফেনা আছে, বাঘা-ঘাস আছে
গণ্ডুষের মতো জল স্থির আছে এখানে-সেখানে
উচ্ছ্রিত জলের মুখে দুহাত বাড়িয়ে দোলা খায়
সুন্দর মানুষ কিছু, বাঘ ছাখে কাঁধ থেকে ঝুঁকে
ব্রাহ্মণের, পাথরের, আকাশের পটভূমি জুড়ে—
এই দেখা হিংস্রতার সঙ্গে সেই সুন্দরকে মেলায়
শামপানে ফেড়েছে, ও কে, কলকাতার গলি ?

আমি এই সংকল্প নিয়েছি

জ্বরের কম্বল থেকে খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলি আঁশ,
যেন জ্বর বসন্তের গুটি
শুকনো-হয়ে-ওঠা চামকুটি !
বাতাসে ছড়াই কিছু মানুষকে আক্রান্ত করবো ব'লে।

রোগে পঙ্গু করে তুলবো—আমি এই সঙ্কল্প নিয়েছি।
শেষ করে দেবো এই বুকে হেঁটে বাঁচার লালসা,
ইঁদুরের মতো এই নিচু হয়ে বাঁচার লালসা !

লাটাই-ঘুড়ির যোগাযোগকারী সুতোও ছিঁড়েছি
জীবনে অসংখ্যবার, তারপর উড়ে গেছে ঘুড়ি।
বটের শাখার শ্লেষ্মা জড়িয়ে ধরেছে মুখপুড়ি…

এককোণা ফাটা, দুই ঝাঁটা মারি ওড়ার লালচে,
কোনোমতে থাকা, শুধু টিকে থাকা অসহ্য আমার।
শুধু নয়, দুহু চাই, যুবগ মশলা এক হাঁড়ি—
সুখ ও সবগ্রভুক্ আমি। হব বামুনের রাঁড়ি !

কক্সবাজারে সন্ধ্যা

চাকমার পাহাড়ি বস্তি, বুদ্ধমন্দিরের চূড়া ছুঁয়ে
ডাকহরকরা চাঁদ মেঘের পল্লীর ঘরে ঘরে
শুভেচ্ছা জানাতে যায়, কেঁদে ফেরে ঘণ্টার রোদন
চারদিকে। বাঁশের ঘরে কালা কালা দোচোয়ানি চাঁদ—
পূর্ণিমার বৌদ্ধ চাঁদ, চাকমার মুখশ্রীমাখা চাঁদ!

নতুন নির্মিত বাড়ি সমুদ্রের জলে ঝুঁকে আছে।
প্রতিষ্ঠাবেষ্টিত ঝাউ, কাজুবাদামের গাছ, বালু
গোটাদিন তেতেপুড়ে, শীতলে নিশ্চান্ত হবে ব'লে
বাতাসের ভিক্ষাপ্রার্থী! জল সরে গেছে বহুদূর।
নীলাভ মসলিন নিয়ে বহুদূরে বঙ্গোপসাগর
আজ, এই সন্ধ্যাবেলা।

ব্ল্যাকডগ মধ্যিখানে নিয়ে দুই কবির কৈশোর
দুটি রাঙা পদছাপ মেলানোর অধিরে ব্যাকুল—
ব্যর্থ আলোচনা করে, গানের হুড়ঙ্গে ঢুকে প'ড়ে,
স্বর্ণাক্ষর বর্ণমালা নিয়ে লোফালুফি করে তীরে!
রূপচাঁদা জালে পড়ে, খোলামকুচির মতো খেদ
রঙিন কাঁকড়ার স্তূপ সংঘ ভেঙে ছড়ায় মাদুরে
একা একা। উপকূলে।

বুদ্ধপূর্ণিমার চাঁদ কক্সবাজারের কনে-দেখা
আলোয় বিভ্রান্ত আজ। অধিকন্তু, ভরসন্ধ্যেবেলা!

আমার কাছে এসো না

আমার হাত বন্ধ, আমার মুঠিতে রাখা বিষ
আমার কাছে এসো না, দুই মুঠিতে রাখা বিষ
একটি ছিলো দেবার এবং একটি নিজে নেবার
এসো না কাছে, আমার আছে দুহাত ভরা বিষ
ভয়ংকর ভয় দেখাই আমার হাতে বিষ

একদা পরমায়ু ছিল শকুন খেয়ে গেছে
চুলের মূলে বকুল ছিলো উকুন খেয়ে গেছে
দুহাতে ছিলো রেখার ভার জোছ্‌ছনার জোছ্‌ছনার
এখন তার বদলে আছে দুহাত ভরা বিষ
এসো না কাছে আমার আছে দুহাত ভরা বিষ।

চারশ বছর প্রাচীনতা

কতকালের প্রবীণতা, হাজার ঝুরিমূলের হাতে তুলে দিলে
লুকিয়ে ফেললে জরার আঘাত, পেঁচার কোটর,
লুকিয়ে ফেললে চারশ বছর প্রাচীনতার
নবীনমূর্তি, ঝুরিমূলের উপঢৌকন।
গাঙ্গেয় দুধ সাপটে শিশুর মতন ধরলে
বেঁচে থাকলে, বেঁচেই থাকলে—
ঘুমের মধ্যে ঝুরি নামলো সারসের পা
জনসভায় স্মৃতিপাষাণ দাঁড়িয়ে রইলে
হাজার বছর অগ্রবর্তী দাঁড়িয়ে রইলে
সময় গঙ্গাজলের মতন কূলপ্লাবী
বাতাস গঙ্গাজলের মতন কূলপ্লাবী
দাঁড়িয়ে রইলে—
বটদেবতা, পূজা ও পাট পাবার জন্যে
মানুষ তোমার সামনে হলো নতমস্তক।

জন্মদিনে

শিশিরভেজা শুকনো খড় শিকড়বাকড় টানছে
মিহুবাড়ির জানলাদোর ভিতর দিকে টানছে
প্রশাখাছাড় হৃদয় আজ মূলের দিকে টানছে

ভালোছিলুম দীর্ঘদিন আলোক দিলো তৃষ্ণা
শ্বেতবিধুর পাথর কুঁদে গড়েছিলুম কৃষ্ণা
নিরাবয়ব মূর্তি তার, নদীর কোলে জলা পাহাড়…
বনতলের মাটির ঘরে জাতক ধান ভানছে
শুভশাঁখের আওয়াজ মেখে জাতক ধান ভানছে
করুণাময় উষার কোলে জাতক ধান ভানছে
অপরিসীম দুঃখসুখ ফিরিয়েছিলো নদীর মুখ
প্রসারণের উদাসীনতা কোথাও বসে কাঁদছে
প্রশাখাছাড় হৃদয় আজ মূলের দিকে টানছে।

জন্মদিনে

জন্মদিনে কিছু ফুল পাওয়া গিয়েছিলো।
অসভ্য খুশি হাসি গালের ভিতরে
একটি বিড়াল একা বাহাত্তুরে থাবা শুনে শুনে
উঠে গেলো সিঁড়ির উপরে
লোহার ঘোরানো সিঁড়ি, সিঁড়ির উপরে
সবার অলক্ষ্যে কালো সিঁড়ির উপরে
শুধু আমি দেখেছি তার দ্বিধান্বিত ভঙ্গি
তার বিবস্ত্রতা

জন্মদিনে কিছু ফুল পাওয়া গিয়েছিলো
এখন শুকিয়ে গেছে।

ও চিরপ্রণম্য অগ্নি

ও চিরপ্রণম্য অগ্নি
আমাকে পোড়াও।
প্রথমে পোড়াও ঐ পা দুটি যা চলচ্ছক্তিহীন,
তারপর যে-হাতে আজ প্রেম পরিচ্ছন্নতা কিছু নেই।
এখন বাহুর ফাঁদে ফুলের বয়স,
এখন কাঁধের 'পরে দায়িত্বহীনতা,
ওদের পুড়িয়ে এসো জীবনের কাছে,
দাঁড়াও লহমা, তারপর ধ্বংস করো
সত্যমিথ্যা রঙে-শ্বেতে শুভ্র জ্ঞানপীঠ।
রক্ষা করো দুটি চোখ
হয়তো তাদের
এখনো দেখার কিছু কিছু বাকি আছে।
অশ্রুপাত শেষ হলে নষ্ট করো আঁখি,
পুড়িয়োনা ফুলমালা স্তবক সুগন্ধে আলুথালু,
প্রিয় করস্পর্শ ওর গায়ে লেগে আছে।
গঙ্গাজলে ভেসে যেতে দিও ওকে মুক্ত, স্বেচ্ছাচারী…
ও চিরপ্রণম্য অগ্নি
আমাকে পোড়াও।

স্মরণীয়

দুপুর রাতে স্নান সেরেছে।
ভাবটা, এখন পুজায় বসবে,
আমার নাকে ধূপের গন্ধ আছড়ে পড়ে
ঠাকুরঘরে
মন্ত্র যখন মাছির মতন ভনভনালো!

বন্ধ ঘরে চাঁদের আলো দেখিয়েছিলাম
প্রবৃত্তি নেই।
বাতাস বইতে দিয়েছিলাম
প্রবৃত্তি নেই।

চতুর্দিকের কিছুই কি নয় স্মরণীয় ?

লিচু চোর

লিচু গাছের ঝুলন্ত সব ডালপালাতে
জড়িয়ে আছে খেলার শিশু, পলকা হাতে
বোঁটার থেকে নিচ্ছে ছিঁড়ে রসের মুঠোর
মতন লিচুগুচ্ছ, এখন বিকেলবেলা।

বিকেলবেলা হাওয়া এবং হাওয়ার দোসর
মরশুমি ফুল উঠছে যখন ছটফটিয়ে—
মাথার উপর ছিন্নমালার সবুজ টিয়ে
তালখেজুরের কোটর পানে করছে ধাওয়া।
আমার চাওয়া লিচুর ডালে চিনির ডেলা
বেচ্‌নেঅলা সাঁতরে আসে জানলা ধারে,
সত্যিকারের বাগানভরা লিচুর গুচ্ছে
অনধিকার চর্চা আমার, নকল খেলা!

আসল খেলা ঐ শিশুদের, সহজ সরল।
মালির বারণ-টারণ ওদের বাঁধতে পারে ?
ফলছে যখন, ছিনিয়ে খাবে—অবহেলায়
ফেলবে কিছু, টাটকা লিচু, এই আঁধারে।

আমরা যাবো রাত-বিরেতে ধরনা দিতে।
দেখবো লিচুবাগানখানি দেয়াল ঘেরা,
দরজা থেকে কেউ কি পারবো ফুড়িয়ে নিতে—
ছড়িয়ে দেওয়া দুইটি লিচু পাতায় চেরা ?

সন্ধ্যায়

সন্ধ্যায় নদীর গান মন্থর লেগেছে
দীর্ঘদিন পর
আলুথালু জেগে ওঠে চর
বালি
জঙ্গলের থেকে নীল কালি
মিশেছে নদীতে
সন্ধ্যায়
নদীর গান মন্থর লেগেছে।
নদী তো দুপুরে ছিল সকালেও ছিল
বেগবান গতি ছিল জলে
এখন কুয়াশা মাখা সন্ধ্যার কম্বলে
মন্থরতা আসে
অলৌকিক নৌকাখানি ভাসে
চাঁদের
বুকের উপরে হাঁটে কারা ?
তারা দেয় নৌকাটি পাহারা।

কারাগার

কারাগারের মতন লাগছে হরিণ-জঙ্গল
কঠোর কারাগারের মতো হরিণ-জঙ্গল
কেননা শীতে পড়েছে পাতা
কচি ও কাঁচা পাতায় গাঁথা
হয়নি আজো গাছপালায় ভরাট জঙ্গল
কারাগারের মতন লাগছে হরিণ-জঙ্গল
কঠোর কারাগারের মতো হরিণ-জঙ্গল

সাঁকো

মধ্যে নদীর চর জেগেছে, মধ্যিখানে সাঁকো—
থাকো, একটি চরে কেন ? দু-চর জুড়েই থাকো।
দু-চর এখন রহস্যময়,
তোমার হাতে আনেক সময়,
থাকো,
মধ্যে নদী, চর জেগেছে, মধ্যিখানে সাঁকো।

অজিতেশ

তোমার মুখ দেখলে মনে হতো কোথাও ত্রুটি হচ্ছে
কপালের সন্ন্যাসের নিচে কেমন দীঘির মতন চোখ ছিল তোমার
দীঘির পাড়ে তালপাতার বাড়িটি বড় খেটেখুটে তৈরি করা
অদূরে বিলাসী অথচ সুকুমার তালধ্বজ
এই ঠুনকো জীবনচারিতায় কোনো যোগ ছিল না তোমার

তুমি বজ্রকণ্ঠে ঘুরে দাঁড়াতে মেঘের দিকে :
আমাদের খরায় তোমার নিমন্ত্রণ নিতেই হবে !

জীবনকে ভারি ভালোবেসে সাপটে ধরেছিলে তুমি
ভালোবাসার বেদনায় চিড় ধরেছিলো কোনো কোনো পাথরে, কঠিন
তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলেছিলে : হ্যাঁ এই ফাটা পাথরেও চাষ হবে
ভালোবাসার ফুল ফুটবে থোকা থোকা, পাতাও আমার চাই
গভীর বিহ্বল সবুজ পাতার পাহাড় থাকবে বাগান ভর্তি তুমি বলেছিলে।

তোমাকে দেখে আমরা, একা অন্যধরনের ভালোবাসা বাসতে শিখেছিলুম
দুই বাহুর আলিঙ্গনে দামাল ঝড়কে বেঁধে ফেলতে তোমাকেই দেখেছি কেবল
আমরা ভয় পেতুম, তুমি সহজেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারতে।
আজ চোখ বুজলেই দেখতে পাই, ঐ শয্যায় তোমায় আঁটে না
গভীর তাৎপর্যময় হাসি হেসে তুমি জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর গাঁটছড়া বেঁধে দিলে
কেমন অনায়াসে
প্রয়োজন ছিল ?
এ-অনুষ্ঠানের কোনো দরকার ছিল কি ? প্রয়োজন ছিল এ শান্ত নাটকীয়তার ?

আমাদের কাছ থেকে একটা ধূমকেতুর প্রখর বিস্ময় এইভাবে সরে গেলো অকস্মাৎ
তুমি রাতের গাঢ়তায় দিনের মতন স্বচ্ছ সুন্দর ছিলে
তোমার সুখে থাকার গল্প আমার কোনোদিনই ভালো লাগে নি
অনিবার্যভাবেই তুমি কাঁটাতার লাফিয়ে গেছো, একজীবন যুদ্ধ করেছো জয়
ক্ষতবিক্ষত হয়েও তুমি সিংহের মতো পরিহাস করতে
ধিক সেই প্রাণবান বাতাসকে, যা তোমার দেহ ফাঁকা করে বেরিয়ে এসেছে আজ।

পারলে হারে

শিশুর হাতে খুচরো, শিশু ছড়িয়ে দিচ্ছে সব উঠোনে।
দুহাত কেঁকে কুড়িয়ে নিচ্ছে রোদের গুঁড়ো ধুলোয় মাখা,
সবটাই অযত্নে রাখা,
জড়ভরত খুচরো, শিশু ছড়িয়ে দিচ্ছে সব উঠোনে !

জড়িয়ে ধরতে শিকড়বাকড় শীতের বাতাস দিচ্ছে হামা।
শিশুটির সন্ন্যাসী জামা,
উত্তোম গা সন্ন্যাসীর জামা।
সংসারসম্পর্ক খুচরো ছড়িয়ে দিচ্ছে সব উঠোনে।

লোকটা পাগল ছাগল, এসে দাঁড়িয়ে আছে বেড়ার ধারে,
শিশুর কাছে পারলে হারে,
এমন খেলায় পারলে হারে।

কলকাতায়, ভোরে

ভোরের ট্রামের মতো প্রেমের সঞ্চার
মানুষের দেহে-মনে। শীত সরে গেছে।
দক্ষিণে ধানের বোঝা নামিয়ে গোলায়
ট্রাক ছুটে চলে যায় দুঃখভরা খড় নিয়ে শুধু
উত্তরের দিকে। ক্রমাগত।

ধীর আলো ফুটে ওঠে ফুলের মতন
টবে, বারান্দায়।
কলকাতা-কলুষ মেখে ফুলগুলি তবু ফুটে ওঠে;
ফুটে ওঠে ঝরে যায় এ মুহূর্তে কতশত শিশু—
মনে পড়ে গেলে আর সুন্দর লাগে না।
মোহময় লাগে না এ-ভোরবেলা তিক্ত কলকাতার!
রাতজাগা শেষ করে মানুষের শ্লথ পায়ে ফেরা
নিজের ঘরের দিকে। কেউ কেউ
ঘর থেকে বাহিরে।

বালকের হাত ধরে বৃদ্ধ যায় বাদাম কুড়োতে!
বাদামের বুড়ো পাতা চুঁড়ে পায় দুচার বাদাম,

তার মধ্যে বাল্যকাল খলসে মাছের মতো নড়ে।
রোদ ওঠে, রোদ উঠে পড়ে,

কাজের কলকাতা তার পোশাক বদলায় ঘরে ঘরে।

চুই চড়ুই

জালির নিচে স্থিতিস্থাপক তেমন কিছু নেই।
চুই চড়ুই কুড়িয়ে আনে সমানে খড়কুটো,
বেশির ভাগ ছড়িয়ে পড়ে শীতল মেজেতেই,
গৃহগড়ার ভরসা, মুখে জালির শত ফুটো!
সহসা ডিম ভাঙবে, শেষ কামনা অভিলাষ—
চুই চড়ুই জালির ফাঁকে করুণ ভাবে বসবে,
একবারের খেলায় শেষে দ্বিতীয় হাঁসফাঁস,
খড়কুটোয় ভরিয়ে পাটা দারুণভাবে বসবে—
বাতাস ডাকাতিয়ার হাতে চড়ুইঘর ধসবেই,
চুই চড়ুই কুড়িয়ে আনুক যত না খড়কুটো!

পাতাল সিঁড়ি

কপাল জুড়ে চন্দ্রবোড়া সাপের ফণা দুলছে,
খুলছে যত শারীরজোড়, বাতাস ভাসা জানলায়—
থমকে আছে সান্ধ্যমেঘ, আলোর প্যাঁচে খুলছে,
পাতালসিঁড়ি ডাকছে মাতো অন্ধকার খেলনায়!

সাবেক আর হালফেশান খেলনা ছিলো সংকর,
দুহাত ভরে নেশার ঘোরে খেলার রীতি ভুলছে,
স্খলিত পায়ে উঠছে শুধু কঠোর পদঝংকার
কপাল জুড়ে চন্দ্রবোড়া সাপের ফণা দুলছে!

ইশারা নয় পাতালসিঁড়ি দুহাত নেড়ে ডাকছে,
গেলে কী পাবো না পাবো তাই ফাটিয়ে গলা হাঁকছে
ইশারা নয়, পাতালসিঁড়ি দুহাত নেড়ে ডাকছে !

একটি সমাজ

একটি সমাজ বৃত্তমধ্যে, একটি সমাজ বাইরে আছে,
এর খানিকটা অংশ আপন, ওর খানিকটা আমার কাছের,
একটি সমাজ নকলনবিশ, অন্যটি তার তুল্যে খাঁটি,
দুইসমাজে ঝগড়া করে পদোন্নতি করছে মাটি।

একটি সমাজ আয়ত্তাধীন, অন্য কিছু বহির্মুখী,
একটি কিছু পরার্থপর, অন্যটি খুব আত্মমুখী,
একটি সমাজ বৃত্তমধ্যে, একটি সমাজ বাইরে আছে,
এর খানিকটা অংশ আপন, ওর খানিকটা আমার কাছে।

পারান্ত কই ?

হঠাৎ যদি লক্ষ্য করো, দেখবে আমার চুল পেকেছে,
গায়ের চামড়া হয়েছে লোল, মুখের ভাঁজে বলিরেখা,
স্থবিরতার বাতাস বইছে, দেহজোড়ের সমস্ত দিক—
সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখি, এ-আমি নিতান্ত একা।

চলন-বলন হয়েছে ধীর, শান্ত পায়ে আস্তে হাঁটি,
কথার মধ্যে থেকে থেকে আড়ষ্টতা হয়েছে লাগ,
সময় হয়ে আসছে এখন নদীর জলে ভেসে যাবার—
কুটোর মতো ভাসতে-ভাসতে কখন যে ছাড়াচ্ছি মাটি !
এই কথাটি বোঝার মতো মাথার উপর চেপে বসে—
পারান্ত কই ? সেই যেখানে কিছুক্ষণের শান্তি পাবো !

এই তো মর্মরমূর্তি!

এই তো মর্মরমূর্তি!
ধুয়ে-মুছে নির্ভুল রেখেছি।
ওষ্ঠ এই, দুই কান, সিংহনাদ নাসিকার ধ্বনি,
কপালে কলঙ্করেখা, চিবুকে সক্রিয় ব্রণদাগ
থুৎনির উপরে কালো আঁচিল রয়েছে সর্বক্ষণ
এই তো মর্মরমূর্তি!
ধুয়ে-মুছে নির্ভুল রেখেছি।

দুভাগের স্কন্ধে রক্তক্ষরণের মতো ভাঙা চুল,
গলায় শঁাখের বলি, উচ্চতে রয়েছে কণ্ঠহাড়,
বুকের উপরে স্তনমূলে কিছু রোম রয়ে গেছে
পিঠে ঢাল পাহাড়ের মেরুদাঁড়া সটানই নেমেছে
নিতম্বে জড়ুল দূর বাল্য ছোঁয়া সমুদ্রের ছোপ
গহ্বরে লিঙ্গের নিচে অণ্ডকোষ সুরক্ষার ঘারী
এই তো মর্মরমূর্তি!
ধুয়ে-মুছে নির্ভুল রেখেছি।

আজানুলম্বিত পায়ে পেশীগুলি শুধু দৃশ্যমান
কলাগাছ দুই উরু, পাকস্থলী, শূন্যতা রাখেনি,
দশনখ অভ্রকণা পদযুগ ফুলপদ্ম পাতা
দাঁড়ানো মর্মরমূর্তি!
ধুয়ে-মুছে নির্ভুল রেখেছি।

ছেলেটি ঘুমন্ত হাতে

ছেলেটি ঘুমন্ত হাতে জড়িয়েছে নিষ্ঠুর পিতাকে।
যিনি সদাভ্রাম্যমান, জনপদে, জঙ্গলে, বিজনে—
এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছুটে যান ক্রমাগত—
যিনি, এই আসছি বলে, দূরে চলে যান অকস্মাৎ।

সংস্রবে না গেয়ে শিশুহাত দুটি জড়িয়ে ধরেছে।
এও হতে পারে সেই স্নেহবাধা তুচ্ছ করে পিতা
ঘোর রাতে চলে যাবে, ত্যাগ করে সমস্ত কিছুই ;
পিছে থাকবে কিছু স্মৃতি, স্মরণীয় শয্যার উত্তাপ,
কেন এরকম করে পিতা, তার ছেলে নাই বোঝে!
কীসের বাহির টান কী সংসর্গ রয়েছে কোথায় ?
কীসের অসুখ এই, পূর্বাপর ওষুধে সারে না!
ছেলেটি ঘুমন্ত হাতে জড়িয়েছে নিষ্ঠুর পিতাকে।

শব্দের ভিতরে ছিলে

শব্দের ভিতরে ছিলে, কিন্তু আমি বাহিরে এনেছি।
এতো দীর্ঘ প্রাণ ছিলো, বস্তুত তা আধো অন্ধকারে
এখন জীবন্মৃত মনে হয়, সে-দুঃখ মেনেছি,
শব্দের ভিতরে ছিলে, কিন্তু আমি বাহিরে এনেছি।

বাহিরে দেখেছি তার কংকাল, সুষমা সেই মোহ
যে আমাকে টেনে এনে দেখিয়েছে দুঃখ বারে বারে
শব্দের ভিতরে ছিলে, কিন্তু আমি বাহিরে এনেছি।

শেষ হবে, এভাবেই হয়

বহুক্ষণ আগে জ্বালিয়েছি
এবার প্রকৃত নিভে যাবে
উড়ে পুড়ে দূরে যাবে ছাই
হয়তো সমস্ত বাসনাই
শেষ হবে।
এভাবেই হয়
কাঠে ঘুণ লাগে, লাগে ক্ষয়
তবে, বুঝি এভাবেই হয়!
কখনো কখনো অন্যভাবে
পা টেনে গা টেনে দিন যাবে
যেভাবেই যাক
পুড়ে খাক
হবে একদিনই।
তারপর বলতে আছে কিছু?
লোকটির নিকটে সব মিছু
লোকটির নিকটে সবই মিছু।

কবিতা টাঙাতে হয়

পুরনো পশ্চিমে ধোঁয়া, পুবের চারদিকে লাগে টান।
চারদিক ঠিক নেই, গন্ধভরা কলংক রয়েছে,
আছে সুখে-দুঃখে আছে, শহরের গাছের মতন।
পুরনো পশ্চিমে ধোঁয়া, লাগে টান পুবের চারদিকে

গাছে গাছে যাই ভুল কবিতা টাঙাতে।
কবিতা টাঙাতে হয়, কবিতার এলোমেলো রূপ,
সাধ্যমতো মাজতে হয় পিতলের বাসনের মতো।

সোনায় পিতলে তবে পাতা এসে পড়ে
ফুল-ফল সবই পড়ে, শুকনো কাঠি পড়ে…

গাছে গাছে যাই ভুল কবিতা টাঙাতে
কবিতা টাঙাতে হয়।
পুরনো পশ্চিমে ধোঁয়া, লাগে টান পুবের চারদিকে—
এ-সময়
কবিতা টাঙাতে হয়, একে একে, শহরের গাছে।

ধান কাটা শেষ, কবিমশাই

ওরা তোমায় অন্ধ ভেবে, চতুর্দিকের পাথর
গুছিয়ে গেঁথে রাখছিলো আর কর্ণিকে কাতর
তুলছিলো মাস রক্তমাখা বালির মতন করে—
শুইয়ে দিতে চাচ্ছিলো ওই শিশুর নড়া ধরে।
ঘাসের কাঁথা পৃষ্ঠে পাতা, বুকে ভরাট মান
ধান কোটা শেষ, কবিমশাই, অন্ধকারে যান।
হাসিরাশির দিন ফুরোলো, চিবোও জিবের ছালা,
প্রেম পীরিতি নারলাম দিতে, উলোটপালোট জ্বালা।
তুই থাকুন, রুষ্ট থাকুন ভাবনাকাজির কাজে,
বাড়িল কিছু পদ্য দিলুম পাথর-ইটের ভাঁজে।
যথেষ্ট যথেষ্ট কবি—ঘুমের মধ্যে যাও…
মণ্ডামেঠাই ঢের খেয়েছো, এবার খাবি খাও।

আমাকে জাগাও

সেগুনমঞ্জরী হাতে ধাক্কা দাও, জাগাও আমাকে
আমি আছি বিষঘুমে, জাগাও আমাকে
আমি আছি সর্পদষ্ট, জাগাও আমাকে
বৈরাগে সন্ন্যাসে আছি, জাগাও আমাকে
আমি জাগবো না, আমি বিষঘুমে, জাগাও আমাকে
যথাব্রত করো, তুমি জাগাও আমাকে
আগুনের ছোঁয়া দিয়ে জাগাও আমাকে
পাপস্পর্শ করে তুমি জাগাও আমাকে
আমাকে জাগাও তুমি বেহুলার মতো
আমাকে জাগাও তুমি লখীন্দরে যবে
সেদিন জাগিয়েছিলে মানুষের মতো
আমাকে জাগাও তুমি ফুলের মতন
পাপড়ির যতনে রেখো পরিপাটি করে
আমাকে জাগাও তুমি ফলের মতন
পরিপক্ক ফল, যার গন্ধ মিষ্ট হবে
জাগাও আমাকে তুমি গাছের মতন
দীর্ঘদেহী গাছ, ঐ গাছের মতন
পাতায় পাতায় জাগবে অরণ্যকুহেলি
জাগাও আমাকে কোনো বনের ভিতর
জাগাও আমাকে সেই বনের ভিতর
যেখানে মঞ্জরী ফুটবে সেগুনের ডালে
ডালে ডালে ছেয়ে যাবে দক্ষিণা আকাশ
আমাকে জাগাও তুমি সেগুনের মতো
কৃষ্ণসার গা লুকোবে দীর্ঘ কচুবনে
বুনো হলুদের ঝাড়ে ছেয়ে যাবে মাঠ
আমাকে জাগাও তুমি হলুদের মাঠে
চঞ্চল হরিণ এসে সম্মুখে তাকাবে
আমাকে জাগাও তুমি সেই পদ্মবনে

যেখানে ছোবল দেবে সাপে সর্বক্ষণ
যদি বিষে বিষক্ষয়, আমি জেগে উঠি
আমাকে জাগাও তুমি গোলাপের মতো
আমূল কাঁটায় ছুঁয় গোলাপের মতো
আমাকে জাগাও তুমি নীরক্ত রঙন
ধীরে ধীরে মুখশ্রীতে লাল রং পাবো
আমাকে জাগাও, করো লেলিহান শিখা
সে আগুনে পুড়ে মরলে ঘুম চলে যাবে
বিষঘুমে ঢলে আছি, আমাকে জাগাও
পুণ্যও-চুম্বন দিয়ে আমাকে জাগাও
আলিঙ্গন করে তুমি আমাকে জাগাও
আশ্লেষে-আশ্লেষে তুমি আমাকে জাগাও
জীবন মরণ কাঠি দুই হাতে আছে
জীবন ছুঁইয়ে তুমি আমাকে জাগাও
তুমি তো স্বপ্নের দেশ থেকে এসেছিলে
তোমার সমস্ত স্বপ্ন আমাকে দেখাও
তাহলে এ বিষঘুমে আমি মুক্তি পাবো
মুক্তি দিতে না পারো তো জাগাও আমাকে
জাগার দুঃখের পথে আমাকেই ছাড়ো
সঙ্গে নেবো তোমাকেও যা ঐশ্বর্য-পতনে
তোমার যা ইচ্ছা হবে, দুই হাতে নেবে
আমি সব দিয়ে যাবো জাগাও আমাকে
শুধু জাগরণ চাই, বারেক জীবন।

এ বয়েসে

ডান হাতে বাঁ হাতে ক্ষত, বাহুর পেনসিল লিখে চলে
যতদূর লিখতে চাই, বাংলাভাষা যেন কথা বলে
অক্ষম জেনেও যেন ফিরিয়ে নেয় না মুখচ্ছিরি
এদিকে সাবান ক্ষুরে, ওদিকে নেয় না যেন বিড়ি
দেখো, বিচ্ছিরি মুখে পাহাড়ের ছায়াই পড়েছে
এরপর মালা দেবে, সভানেত্রী বসেছে সঠিকই !
টিলার ওপর থেকে সাদুতল দেখায় প্রকৃত
ঘরদোর, চলে এসো, এ-বয়েসে হেনস্থা কোরো না
তোরঙ্গের মায়া মালো, শীতের তোষক—
এ-বয়েসে হেনস্থা কোরো না,
চতার উপরে উঠে হেনস্থা কোরো না
চিতার গরম, তুমি ভালোবাসো, জানি
এ-বয়েসে হেনস্থা কোরো না।
চলে এসো, এ বয়েসে হেনস্থা কোরো না।

যাবার সময় হলো

জীবনযাপনে কিছু ঢিলেঢালা ভাব এসে গেছে।
চেতনার ক্ষিপ্র কাজ এখন তেমন ক্ষিপ্র নয়—
কেমন আলস্যে আমি শুয়ে থাকি, আর দেখি চাঁদ,
বাঘের মুড়োর মতো চাঁদ পড়ে আমার বাগানে।
আমার ক্ষিপ্রতা গেছে, তার সঙ্গে গেছে হিংসা লোভ,
কবি হয়ে দাঁড়াবার আর কোনো সাধ নেই মনে।
শেষ হয়ে গেছে লোকটা, এও শুনে লাগে না আঁচড়
গায়ে, সব শুনে শুই পাশ ফিরে সন্ত্রাস্ত বিশ্রামে।

গতরাতে শেষকরা পঙ্‌ক্তিটির তুমুল উত্তাপ
এখন পারি না দিতে সভাঘরে, বিশিষ্ট শ্রোতাকে।
পুরনো প্রাক্তন লেখা সেকালীন দুর্গন্ধে জড়ানো—
সেইসব পাঠ করে কোনোমতে আত্মতৃপ্তি পাই!
সুতরাং ভালো নেই, পরিপার্শ্ব চাপ তৈরি করে—
যাবার সময় হলো, নেতার আগেই ভালো যাওয়া।

ও অনন্তমনা

হাহাকারে ফেলে তাকে, পাখি উড়ে গেছে
গাছের নিজস্ব নয়, শকুনের দল!
এখন গাছটি আছে ডালপালা সম্বল,
পাতাপুতাহীন গাছ শ্মশান হয়েছে।
শ্মশানের মতো উদাসীনতায় নয়,
বেঁচে-বর্তে না থাকার ঘোরতর ভয়
গাছের সর্বত্র, জানি, শিকড়েও ঘুণ
লেগেছে, লেগেই আছে, সাদর সংশ্লেষে!

থাক হাহাকার, পাখি উড়ে গেছে, যাক।
অন্তত সুকাল ফিরে আসার প্রত্যাশা
বেঁচে থাক, গাঁটে-জোড়ে, কাঠের অন্তরে।
ধীর উচ্চারণময় বাসন্তী মন্তরে
হয়তো উঠবে জেগে, হিমঘুম থেকে,
পল্লবে-পল্লবে ছেয়ে যাবে বাহু দুটি
গাছের, কাছের জলপ্রান্তের ডাহুকী
দেবে ডাক, আছে থাক, ও অনন্তমনা॥

ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফ্যালে

বহুবার হারিয়েছে ব'লে আজ কেউ
লোকটিকে খোঁজে না আর, সুতো ছাড়তে থাকে।
যতো দূর যেতে চায়, যাক, বেঁচে থাক।
অমৃত্যু মাথার 'পরে মুকুট দিয়েছে—
অনেকেই চেনে তাকে, অনেকে চেনে না।
বোঝে কিছু, বোঝে মিছু কোনো কোনো লোক,
কিছুই লাগে-না-ভালো এমন অসুখে
লোকটি উচ্ছন্ন আজ, বেঁচে-বর্তে আছে
কোনো মতে। বেঁচে থাক, দুঃখী হয়ে থাক।
কিন্তু, কী যে দুঃখ তার নিজেই জানে না,
লোকটি কবি, ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফেলে দেয়!

সকলের চেয়ে বেশী অহংকার নিয়ে

কেউ কি প্রকৃত ঠিক করে দিয়েছিলো?
নাকি বাহুবলে তাকে বাগানের ঞ্জ-মধ্যে রেখেছি
এবং নিশ্চিন্ত আছি, কিছুদিন—জানি দাঁড়াবে না
পা দিয়ে চৌকাঠে যেন বলবে না, এখন তোমার
বাগানে যাবার পালা—কিছুদিন গাছ হয়ে থাকো
শিকড় যেখানে যায়, তুমি যাও—গিয়ে দেখে এসো
ঘেঁষ বালি চুন কার—মানুষের মহিমার চেয়ে
এদের দাবিও কিছু অল্প নয়, সামান্যও নয়।
ঘরে তাই জামা পরে বসে আছে করবী কাঞ্চন
এক পাটি জুতো পায়ে সুপারি দাবায় একা খেলে

লেবুর কাঁটায় কাঁথা, মলিনা নিয়েছে ক্ষিপ্র যুঁই
অলস গোলাপ বেলি শুয়ে আছে মাথার বালিশে
ঘর ভরে গেছে মাংসে—সবুজ হলুদ নম্র নীল

সকলের চেয়ে বেশী অহংকার নিয়ে একা আছি।

গাছ কথা বলে

গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি
সন্ধ্যায় সকালে—
প্রতি গাছে জল দিই, ফুল দেয়
পরিবর্তে গাছ।
এই দেওয়া-নেওয়া চলে অনুচ্চারিত
মৃদু প্রেমে,
গাছ ও মানুষে বোঝে এই প্রেম, আর
কেউ নয়।
গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি
সন্ধ্যায় সকালে।
সকলেই গাছ নয়, কিছু কিছু
আগাছাও আছে,
তাদের নিড়ুনি দিয়ে তুলতে হয়, গাছ
সুখে থাকে,
সুখে থাকবে বলে গাছ অবহেলে
ওদের দেখায়—
আগাছাও তুলে ফেলতে কষ্ট হয়,
তারও ফুল আছে।
হয়তো কৌলীন্য নেই সূর্যমুখী বেলির
মতন,

তবুও তো সে ভালোবেসে আমাদের
বাগানে বসেছে।
জল বিনা দিচ্ছে ফুল বহু রঙে নানান
আকারে—
সুখে থাকবে ভালো থাকবে বলে
গাছ, তাকে তুলতে হয়,
গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি, গাছ
কথা বলে॥

জেগে থেকে না খেলার অপরাধ গ্লানি

উত্ত্যক্ত হয়েছি আমি শব্দের আক্রান্ত জ্বরে, মোহে!
চিত্র অন্তর্হিত, আমি কীভাবে সে শব্দকে সাজাবো?
সে-বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান আজ লুপ্ত হয়ে গেছে,
এতোল বেতোল খেলা খেলি আমি শব্দ নিয়ে শুধু।
মনে মনে ভাবি, দিই শব্দ ছুঁড়ে আমার বাগানে,
ফুলের গাছের পাশে ইটের টুকরোর মতো থাক্।
বৃষ্টি পাক, বায়ু পাক অথবা গরমে সিদ্ধ হোক,
উত্ত্যক্ত হয়েছি আমি শব্দের আক্রান্ত জ্বরে, মোহে!
আগে কিছু শব্দ পেলে খেলাঘর সাজাতে পারতাম।
মনে হয়, বয়েসে সে-খেলাঘর বর্জন করেছে—
আমাকে, করেছে ঋণী মৃত্যুর চিন্তার হিমঘুমে—
ঘুমন্ত, স্বপ্নের দেশে, খেলা করি শব্দের সহিত।
অনিবার্য আর নয় জেগে থাকা কালান্ত বৈশাখে,
জেগে থেকে না খেলার অপরাধ, গ্লানি দুইই আছে॥

ঈশ্বর আছেন একা

ঈশ্বর আছেন একা।
উৎখাত করা চলে যে কোনো সময়—
কোনো কাজ নেই শুধু দৃষ্টিপাতে যেন জগন্নাথ!
মানুষের প্রতিহিংসা-বোধ থেকে দূরে থেকে যান,
সদা ও সর্বদা দূরে, নিরস্ত্রের উপরে হিংসার
তর্জনী উঠলেও তিনি, স্থির অবিচল।
মানুষের রোষমুক্তি কোন্‌কালে হবে?
আকাঙ্ক্ষা থাকবে না তার পরের বৈভবে!

পাখি

সুসংহত হলো প্রেমে,
আগে কিছু ছন্নছাড়া ছিলো,
ছিলো আলুথালু,
এখন সংহত হলো সুগভীর প্রেমে।
প্রেম, দেহ নয় তাও অন্তরে জেনেছে—
সুতরাং হয়ে আছে পাথরের মতো,
নিবাত, নিষ্কম্প।
শুধু খেলা করে দুটি ঠোঁট দিয়ে
পাখির মতন,
তাকে পাখি বলে জানো।

এই কুষ্ঠরোগী প্রাণ

এই কুষ্ঠরোগী প্রাণ, এই ভালোবাসা
প্রকৃত কুঠোকে কি গো ভালোবাসা যায়—
কোন্ প্রয়োজনে লাগে ? প্রকৃত দু'হাত
যে বের করেনি, তাকে, কুঠো বলা যায় ?
দু'হাতের সন্দেষ্টনী আমাকে ভাবায়
বলে, ভালো আছি কিনা, পরাঙ্মুখ কিনা
দু'হাতের সুবেষ্টনী আমায় করেছে—
নিতান্ত সম্পর্কহীন, ভালোবাসাহীনও।
এপারে-ওপারে আছে আপনতা ঠিকই
অসংখ্য মৌচাকে সে কি ঢিল মেরে যেতো
এপারে-ওপারে আছে আপনতা ঠিকই
বাঘের নখের মতো মাঘের হিমানী—
এই কুষ্ঠরোগী প্রাণ, এই ভালোবাসা
প্রকৃত কুঠোকে কি গো ভালোবাসা যায় ?

অন্যথা করো না

ভাঙাচোরা অস্ত্রে তুমি সংগ্রাম করেছো,
তেরোটি শতক ধরে সংগ্রাম করেছো,
এখন যাবার পালা, আমি বলি যাও
আসন্নকে আসতে দাও আমার ভিতরে,
দীর্ঘতম নদী তুমি আশ্রয় করেছো
আমি বলি : দর্ভি
নদীকে বলতে দাও আলয়ের পাশে।
আসন্ন শতক ঘিরে আমরা বেঁচে আছি—
বেঁচে থাকতে দাও, কিছু অন্যথা করো না,
শুধু বাঁচতে দাও, কিছু অন্যথা করো না।

অসমগ্রন্থনা

ঈশ্বরের দু বাগানে জল
একটিতে আমি বসে,
অন্যটিতে অনন্ত কিশোরী,
আমি বৃদ্ধ অথচ কিশোরী
আমার সংস্পর্শে এসে রঙিন আকুল হয়ে পড়ে।
এ দুটি বাগান ছাড়া এ-রহস্য অন্যত্র কোথাও
নেই,
অন্যত্র সাধারণভাবে কথাবার্তা হয়—
অন্যত্র সমাজ আছে, সমাজের তীব্র চোখ আছে
অসমগ্রন্থনে !

দায়

মানুষের বুদ্ধি তাকে বৃদ্ধ করে রাখে।
ও সময় অলস সময়—
বাগানে বসেই বয়ে যায়।
তৎপরতা কিছুতে জাগে না,
শুধু যদি ঘুম হতো,
হিমঘুম একদিন হবেই।
এখন তা আসতে বাকি,
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি হয়,
একদিন হবে না।
একদিন একা ধ্বনি ফিরে আসবে হরিধ্বনি হয়ে—
তোমার শোনার দায় নেই !

ফিরে এসো মালবিকা

মালবিকা অইখানে যেওনাকো তুমি,
কথা কয়োনাকো অই যুবকের সাথে,
কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে ?
মালবিকা জানো তুমি ঘাসে কি লবণ ?
সামনে দেওদার বন, আমি বসে আছি।
ফিরে এসো মালবিকা কী সুস্বাদ এখানে, জীবনে—
ফিরে এসো মালবিকা যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর,
শান্তিনিকেতনে আমি দেখেছি পলাশ—
ফিরে এসো মালবিকা,
ও-পলাশে তোমাকে সাজাবো ;
রাঙা ধুলো দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো ;
ভালোবাসা দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো।
ফিরে এসো মালবিকা,
যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর।
এখানে মন্দিরে-মেঘে আশ্চর্য ঝংকার—
ফিরে এসো মালবিকা, ইচ্ছে করো, এখনই এসো !

এলিজি

[সমরেশ বসু স্মরণে]

নির্দিষ্ট ব্যথার দিন দেখা হয়েছিলো
অথচ কী হাসি ছিলো সম্মুখে আমার
রাজকীয় হাসি ছিলো সম্মুখে আমার
নির্দিষ্ট ব্যথার দিন ছিলে বর্ণনীয়
কেমন বর্ণনা দিই, তুমি ছিলে বসে—

নিভৃত, চেতনশূন্য—দেয়াল-দরোজা
সব ফাঁক, দূরে যাক—যাবে হাওয়া আগে
ঘনিষ্ঠরা কাছে নেই, তুমি ছিলে বলে
এক আকাশ ছায়া নিয়ে তুমি বসে ছিলে।

শুনেছি, সমুদ্রে ঢেউ তখনি উঠেছে
আয়ু যৎসামান্য, তার অগোছালো হাতে
কতটা যে বাঁচা যায়, তাই মারা গেলে
গোধূলির মায়া এসে তোমাকেই ছুঁলো—
কী তরুণ তপস্বীর মুখশ্রীকে আজ
চেতনসর্বস্ব রামকিংকরের মুখ

শাদা পাতা

শোকময় শাদা পাতা নিষ্পলক চোখের মতন পড়ে আছে।
কোথাও মালিন্য নেই, কালির আঁচড় নেই কোনও,
দাগ কেটে যাবে বলে, অপদার্থ কবি,
লক্ষঝম্প ক'রে, খুবই কেঁদে-কেটে, এই অবস্থায়…
আজ ধুম জ্বর হয়ে বসে আছে, বাতিল জামার
মতন, আলনার পাশে। ব্যবহার, অভ্যর্থনা নেই।
অসহায়তার কালি-মাখা মুখ, ঠুঁটো জগন্নাথ,
জানে না দু পায়ে ভর দিয়ে উঠতে পারবে কি পারবে না?
শোকময় শাদা পাতা সাতিশয় শাদা হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে…

প্রাসঙ্গিক

একটি মর্মরমূর্তি জলজ বেষ্টনে···
যুবাকালে দেখা গেলে হতো লোভ, প্রণয়স্থাপন—
এখন নিঃসঙ্গ তার জলজ যৌবন,
আমাদের কাছে।
বনে কিছু মরা ডাল আছে ;
জঙ্গলে বৃদ্ধের কাজ কম—
শুধু কিছু চোখে দেখা, কানে শোনা কিছু,
আক্রান্ত হওয়ার মতো কিছু কাছে নেই
বেশিদূর যাওয়াও বারণ,
বৃদ্ধশরীরের স্নায়ু টান টান ক'রে
সমাজের প্রান্তে আসা বড়ো প্রাসঙ্গিক—
এখন এ-সন্ধ্যাবেলা।

শুধু এই

সকল প্রতাপ হলো প্রায় অবসিত···
আলাহীন হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে
কিছু মায়া রয়ে গেলো দিনান্তের,
শুধু এই—
কোনোভাবে বেঁচে থেকে প্রণাম জানানো
পৃথিবীকে।
মূঢ়তার অপনোদনের শান্তি,
শুধু এই—
ঘৃণা নেই, নেই তিক্ততা,
জীবনযাপনে আজ যতো ক্লান্তি থাক,
বেঁচে থাকা শ্লাঘনীয় তবু।

———